প্রশ্ন-১। ক) সফদরউল্লাহর মানসিক পরিবর্তনের প্রধান কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

খ) '১৯৭১' উপন্যাসে প্রতিফলিত নীলগঞ্জের জনজীবনের পরিচয় দাও। ৭

১(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

পাকিস্তানি মিলিটারিদের পশুসুলভ আচরণ সফদরউল্লাহর মানসিক পরিবর্তনের প্রধান কারণ।

'১৯৭১' উপন্যাসে নীলগঞ্জ নামক এক গণ্ডগ্রামে মিলিটারি প্রবেশের পর নানা রকম অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে থাকে। ইতঃপূর্বে এই গ্রামের মানুষজন মিলিটারি সম্পর্কে যা জানত, সবই অন্য মানুষের কাছ থেকে শোনা গল্পের মতো। পাকিস্তানি মিলিটারিরা মুসলমান হওয়ায় তাদের সম্পর্কে অনেক ইতিবাচক কথা গ্রামবাসী বিশ্বাস করত, যেমন: তারা মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করে না, কালিমা জিজ্ঞেস করে, মুসলমান মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়ার তো সম্ভাবনাই নেই ইত্যাদি। জয়নাল মিয়ার সাথে কথা বলে তাই সফদরউল্লাহ আশ্বস্ত হয় যে গ্রামে মিলিটারি এলেও তার পরিবারের নারী সদস্যদের অন্য কোথাও স্থানান্তর করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তার বিশ্বাস ভঙ্গ হতে সময় লাগেনি। মিলিটারি সুবাদারের হাতে তার স্ত্রী ও শ্যালিকা নির্যাতনের শিকার হলে তা তার মনে ব্যাপক আঘাত হানে। ফলে সে মিলিটারিদের প্রতি চরম ঘৃণা বোধ করে এবং দা হাতে নিয়ে নির্যাতনকারী মিলিটারিকে হত্যা করতে বেরিয়ে যায়।

১(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হিসেবে যিনি নিজের অবস্থানকে সুউচ্চে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর নাম হুমায়ূন আহমেদ। এই গুণী কথাসাহিত্যিক ছিলেন কালির সামান্য আঁচড়েই মানুষ ও জনজীবনের আলেখ্য তুলে ধরতে সিদ্ধহস্ত। '১৯৭১' শীর্ষক উপন্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়। এ উপন্যাসে তিনি সুনিপুণ হাতে নীলগঞ্জ গ্রামের জনজীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

লেখকের বর্ণনা মতে, জঙ্গলা মাঠের পিছনে নীলগঞ্জ গ্রাম। দরিদ্র, শ্রীহীন ত্রিশ-চল্লিশ ঘরের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ। বিস্তীর্ণ জলাভূমি গ্রামটিকে কান্তের মতো দুইদিকে ঘিরে আছে। এখানকার লোকজন প্রধানত কৃষিকাজ করে জীবিকানির্বাহ করে। এখানকার জমি যথেষ্ট পরিমাণে উর্বর নয় কিংবা এরা ভালো চাষি নয়। তবে শীতকালে এরা প্রচুর রবিশস্য ফলায়। বর্ষার আগে চাষ করে তরমুজ ও বাঙ্গি। গ্রামের অধিকাংশ ঘরেই খড়ের ছাউনি। সম্প্রতি কয়েকটি টিনের ঘর হয়েছে। অতীতে চন্দ্রকান্ত সেন প্রচুর ধনসম্পদ করলেও তার বর্তমান উত্তরসূরি নীলু সেনের অবস্থা যেন ব্যাঙের আধুলির অধিকারী। বর্তমানে গ্রামে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী ব্যক্তি হলো জয়নাল মিয়া। টাকাপয়সা বেশ থাকলেও লোকটি মেরুদণ্ডহীন। গ্রামে বিদেশি বা বাইরের লোক আছে দুইজন। একজন নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম সাহেব এবং দ্বিতীয়জন হলেন নীলগঞ্জ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক আজিজ মাস্টার। ইমাম সাহেব মসজিদেই থাকেন এবং আজিজ মাস্টার থাকেন জয়নাল মিয়ার বাড়িতে। দুইজনের খাবারদাবারের ব্যবস্থা হয় প্রধানত জয়নাল মিয়ার বাড়ি থেকে। ইমাম সাহেবের খাবার অবশ্য গ্রামের আরও কয়েক বাড়ি থেকেও আসে।

নীলগঞ্জের যে দিকটায় জলাভূমি, একদল কৈবর্ত থাকে সেদিকে। মাছ ধরার সিজনে জলমহালে মাছ ধরতে যায়। নীলগঞ্জের কেউ এদের ঘাঁটায় না। এমনকি এরা খুনখারাবি করলেও নীলগঞ্জের মাতব্বররা কিছুই না জানার ভান করে। কৈবর্তপাড়ার চিত্রা বুড়ি সন্তান হারিয়ে বিচারের আশায় এখানে- সেখানে ঘুরলেও কোনো প্রতিকার পায় না। গ্রামের একমাত্র ভিক্ষুক সে। এদের বাইরে একজন পাগলও আছে এ গ্রামেড় মতি মিয়ার শ্যালক নিজাম। ছোটাছুটি করা এবং বনের ভিতরে বসে থাকা ছাড়া সে কোনো উপদ্রব করে না।

সবশেষে বলা যায় যে, নীলগঞ্জের জনজীবন বাংলার আর দশটা সাধারণ গ্রামের জনজীবনের মতোই। সহজ, স্বাভাবিক ও কৃত্রিমতাবর্জিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত এ গ্রামের লোকজন।

প্রশ্ন-২। ক) 'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে অনেকেই এরকম করবে।'- এ উক্তিটি কার? উক্তিটি করার কারণ কী ছিল? বুঝিয়ে লেখো। ৩

খ) রফিক ও মেজরের সম্পর্কের টানাপড়েন কীভাবে কাহিনির গতিপথকে প্রভাবিত করেছে? তাদের মধ্যকার সংঘাতের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৭

২(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে অনেকেই এরকম করবে'- মেজর সাহেবের কথার উত্তরে রফিক উক্তিটি করেছিলেন।

মেজর এজাজ নীলগঞ্জ গ্রামে এসে একটা আতঙ্কজনক পরিবেশ সৃষ্টি করতে তৎপর হয়। স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে ক্যাম্প করার পরপরই স্কুল মাস্টার আজিজ মাস্টারকে স্কুলঘরে বন্দি করে রাখে। কথা আদায়ের নামে সে পাশবিক অত্যাচার করে। মেজর এজাজ তার

সহযোগী বাঙালি যুবক রফিককে নির্দেশ দেয়, সে যেন আজিজ মাস্টারের পুরুষাঙ্গে ইটের টুকরা ঝুলিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় পুরো গ্রাম ঘুরিয়ে আনে। আজিজ মাস্টারকে লজ্জাজনক শাস্তি অথবা মৃত্যু- দুইটির মাঝে একটি বেছে নিতে বললে তিনি লজ্জাজনক শাস্তি বেছে নেন। বাঙালি মাস্টার মৃত্যু এড়িয়ে যেতে চাওয়ায় সমগ্র বাঙালি জাতিকেই সে কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে।
এ রকম কঠিন পরিস্থিতিতে মানুষ যেকোনো রকম আচরণই যে করতে পারে এবং তা যে অস্বাভাবিক - এ কথা বোঝাতেই রফিক প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেন।

২(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে '১৯৭১' শীর্ষক উপন্যাস রচনা করে তাঁর। সাহিত্যিক খ্যাতির ধারাবাহিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এ উপন্যাসে পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনীর কমান্ডার মেজর এজাজ ও তার সহযোগী হিসেবে কাজ করা এদেশীয় যুবক রফিকের কথোপকথন এবং কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার সম্পর্কের জটিল ধাধা উন্মোচিত হয়েছে।
রফিক মেজর এজাজের সহযোগী হিসেবে মিলিটারি দলের সাথে নীলগঞ্জ গ্রামে প্রবেশ করে। তিনি অনেকটা দোভাষীর কাজ করেন। প্রথম দেখায় তাকে মেজর এজাজের খাসসলোক বলে মনে হলেও উপন্যাসের কাহিনি যতই এগিয়েছে তাদের উভয়ের সরল সম্পর্কে জটিলতা ততই প্রতিভাত হয়েছে। নিজ দেশের মানুষের প্রতি অকারণে ঘৃণ্য আচরণ ও হত্যাকাণ্ডে মেজর এজাজের পাশে ছায়ার মতো সর্বদা অবস্থান করলেও মন থেকে সেসব মেনে নিতে পারেননি রফিক।
ন্যায়বিচার করার নামে মনা ও তার ভাইকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে মেজর মূলত গ্রামের মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলতে চেয়েছে। মনাকে অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি মানলেও তার নির্দোষ ছোটো ভাইকে শাস্তি দেওয়া মানতে পারেননি রফিক। অবশ্য মেজর এজাজ যুদ্ধকালীন বাস্তবতার দোহাই দিয়ে 'এই সময়ে কিছু অন্যায় হবেই' বলে নিজের নিষ্ঠুরতাকে বৈধতা দিতে চায়। এরপর নীলু সেনকে নিজ বাড়িতে হত্যা, ...সফদরউল্লাহর স্ত্রী ও শ্যালিকার উপর মিলিটারির নির্যাতন, মসজিদের ইমাম সাহেব ও আজিজ মাস্টারকে স্কুলঘরে বন্দি করে নির্যাতন, বারবার অদৃশ্য মুক্তিবাহিনীর প্রসঙ্গ টেনে এনে সমগ্র গ্রামবাসীকে শত্রুজ্ঞান করা এবং পুরো বাঙালি জাতিকে চরম অবজ্ঞা করে কথা বলায় রফি মানসিকভাবে মেজর এজাজের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য তার এরূপ মনোভাব মেজর এজাজ ঠিকই বুঝতে পারে এবং রফিককে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। রফিকের জীবনাবসান ঘটে একজন অদৃশ্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। রফিকের মৃত্যুই মূলত উপন্যাসে শেষ পেরেক ঠোকে,
অর্থাৎ বাঙালি আর পাকিস্তানি যে আদতে কেউ কারো নয়, তার ফয়সালা হয়ে যায়।
উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, পাশাপাশি গায়ে গা ঘেঁষে চলা মেজর এজাজ ও রফিক যে আদতে পরস্পর বিরোধী রক্তের মানুষ তা উপন্যাসের শেষে পরিষ্কার হয়েছে। মেজর এজাজ ও রফিকের সম্পর্কের টানাপোড়েনই'১৯৭১' উপন্যাসের গতিপথ নির্ধারণ করেছে।

প্রশ্ন-৩। ক) আজিজ মাস্টারের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
খ) রফিক চরিত্রটি তোমার কাছে কি দ্বিমুখী চরিত্র মনে হয়? তোমার উত্তরের পক্ষে কারণ দেখাও। ৭

৩(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

পাকিস্তানি মিলিটারিদের গুলি খেয়ে মৃত্যুবরণ করার মাধ্যমে আজিজ মাস্টারের উপর করা নির্যাতন পরিণতি পেয়েছে।
নীলগঞ্জ গ্রামে মিলিটারি প্রবেশের কিছুক্ষণ পরই মেজর এজাজ আজিজ মাস্টারকে ডেকে পাঠায়। আজিজ মাস্টার তার সাথে দেখা করতে এলে নানা রকম কথাবার্তার এক পর্যায়ে মেজর এজাজ তাকে স্কুলঘরে বন্দি করে রাখে। তার সাথে মসজিদের ইমাম সাহেবকেও বন্দি করা হয়। এরপর শুরু হয়,মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে তথ্য আদায় করার নামে নির্মম নির্যাতন। জয়নাল মিয়ার মেয়ে মালার প্রতি আজিজ মাস্টারের দুর্বলতার কথা জানতে পেরে তাকে উলঙ্গ করে পুরুষাঙ্গে ইটের টুকরা বেঁধে মালার সামনে হাজির করতে চায় মেজর সাহেব।
মাস্টার প্রথম দিকে মৃত্যুভয়ে এহেন চরম অপমানজনক শাস্তি মেনে নিলেও এক পর্যায়ে মৃত্যুকেই নিজের পরিণতি হিসেবে মেনে নেন। এরপর মেজর সাহেবের নির্দেশে মিলিটারিদের গুলিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৩(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

রফিক চরিত্রটি জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ রচিত '১৯৭১' শীর্ষক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র। উপন্যাসের গতিপথ নির্ধারণে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আপাতদৃষ্টিতে রফিক চরিত্রকে দ্বিমুখী মনে হলেও উপন্যাসের শেষে এসে তিনি নিজেকে স্বদেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একজন বীর সৈনিক হিসেবে উপস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন।

নীলগঞ্জ গ্রামে রফিকের প্রবেশ অত্যন্ত নাটকীয়; মিলিটারি বাহিনীর সাথে, কমান্ডার মেজর এজাজের সহচর হিসেবে। মেজর এজাজ যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণে বাংলায় কথা বলতে পারে না; তাই তার দোভাষীর ভূমিকায় দেখা যায় রফিককে। নীলগঞ্জের লোকজনের সাথে মেজর এজাজের যেসব কথাবার্তা হয় সকলই রফিকের মাধ্যমে। ফলে শুরু থেকে উপন্যাসের কাহিনি পরিণতির দিকে ধাবিত হওয়ার আগ পর্যন্ত যে রফিককে দেখা যায়, তাতে পাকিস্তানি মিলিটারির দোসর মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে আজিজ মাস্টার ও ইমাম সাহেবকে কথা বলার ক্ষেত্রে বারবার সতর্ক করে দেওয়া তার চারিত্রিক দ্বৈততার প্রকাশ বলেই মনে হয়।

কাহিনি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রফিকও রীরে ধীরে তাঁর চরিত্রের রহস্যময় দিকগুলো প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে মেজর এজাজের বর্বর আচরণই অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। তিনি মেজর এজাজের সাথে চলতে চলতেই দেখেছেন, পাকিস্তানি মিলিটারিরা এ দেশের মানুষকে তাদের মতো এজাজের মানুষ বলে গণ্য করে না। 'তোমার দেশ' বলে রফিকের সাথে কথা বললে রফিক এটিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে উদ্যত হলে মেজর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। উভয়ই যেন উভয়কে নতুন করে চেনার পথে যাত্রা শুরু করে এখান থেকে। রফিক লক্ষ করেন, মেজর এজাজ কারণে-অকারণে চরম নিষ্ঠুরতা দেখায় মূলত গ্রামের মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলতে। মিলিটারিদের অত্যাচার, নির্যাতন, নারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া, দোষী-নির্দোষ নির্বিচারে যাকে-তাকে হত্যা করার এসব দৃশ্য যে সারা দেশেই পাকিস্তানিরা করে যাচ্ছে, তা আর বুঝতে বাকি থাকে না তার। তিনিও ধীরে ধীরে খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে উদ্যত হন। একপর্যায়ে মেজর এজাজও বুঝে যায় যে, তার জন্য রফিকের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। সামনে দাঁড়িয়ে থেকে মিলিটারিদের দিয়ে গুলি করিয়ে তাঁকে হত্যা করে।

পুরো উপন্যাস জুড়ে রফিকের কার্যকলাপ বেশির ভাগ সময়ই পাঠককে দ্বিধাগ্রস্ত করে। তবে বাঙালি ও বাংলাদেশের উপর ক্রমাগত নিষ্ঠুরতা চালানো পাকিস্তানি মিলিটারি তাঁর চোখ খুলে দিয়েছে। হাসতে হাসতে দেশমাতৃকার বীরসন্তান হিসেবে মৃত্যুকে বেছে নিয়ে তিনি নিজেকে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রশ্ন-৪। ক) মীর আলিকে মেজর এজাজ কেন সালাম দিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

খ) নিন্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনে যুদ্ধের বর্বরতা '১৯৭১' উপন্যাসে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো। ৭

<u>৪(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

মীর আলিকে দেখে নিজের অন্ধ বাবার কথা মনে পড়ায় তাকে মেজর এজাজ সালাম দেয়।

সহচর

'১৯৭১' উপন্যাসে নীলগঞ্জ গ্রামে যে পাকিস্তানি মিলিটারিদের দল এসে ক্যাম্প করেছে তাদের কমান্ডার হলো মেজর এজাজ। সে একদিন তার রফিককে নিয়ে গ্রামে ঘুরতে বের হয়। সে সরেজমিনে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে চায়। পথিমধ্যে বৃদ্ধ মীর আলিকে সে দেখতে পায় বাড়ির বাইরে টুলের উপর বসে থাকতে। রফিকের মাধ্যমে সে জানতে পারে যে লোকটি অন্ধ। বাড়ির বাইরে বসা অন্ধ বৃদ্ধ লোকটিকে বসে থাকতে দেখে তার নিজের বাবার কথা মনে পড়ে।

রেশোবা গ্রামে তার বৃদ্ধ অন্ধ বাবাও এমনিভাবে বাড়ির বাইরে বসে থাকে। সেকথা মনে হতেই সে মীর আলিকে সালাম দেয়।

<u>৪(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

পাঠকসমাজে বিপুল জনপ্রিয় সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের লেখায় বারবার উঠে এসেছে দেশ, দেশের মানুষ, ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রভৃতি। '১৯৭১' তাঁর লেখা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনাবলির মধ্যে অন্যতম। এ উপন্যাসের শুরুতে নীলগঞ্জ গ্রামের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে গ্রামটিকে আবহমান বাংলার আর দশটা সাধারণ গ্রামের মতোই মনে হয়। তবে গ্রামে পাকিস্তানি মিলিটারি প্রবেশ করার পর থেকে ধীরে ধীরে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়।

নীলগঞ্জ গ্রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক একে দরিদ্র, শ্রীহীন, ত্রিশ-চল্লিশ ঘরের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ বলেছেন। বিস্তীর্ণ জলাভূমি গ্রামটিকে কাস্তের মতো দুইদিকে ঘিরে আছে। কৃষিকাজ করেই মূলত এখানকার লোকজনের জীবিকার সংস্থান হয়। গ্রামের অধিকাংশ ঘরেই খড়ের ছাউনি। সম্প্রতি কয়েকটি টিনের ঘর হয়েছে। বদিউজ্জামানের মতো হাতেগোনা দুই-একজন কাজের জন্য গ্রামের বাইরে যায়। গ্রামে একটি মসজিদ ও একটি প্রাইমারি স্কুল রয়েছে। এলাকার বাইরের মানুষ বলতে মসজিদের ইমাম সাহেব ও স্কুল

মাস্টার আজিজুর রহমান মল্লিক। গ্রামের সাধারণ জনগণের বাইরে নীলগঞ্জের জলাভূমিটার পাশে একদল কৈবর্ত বসবাস করে। গ্রামের সঙ্গে অবশ্য তাদের খুব একটা সংযোগ নেই। মাছ ধরার সিজনে এরা
'জলমহালে মাছ ধরতে যায়। আবার ফিরে আসে।
এ রকম একটা গন্ডগ্রামে মিলিটারি প্রবেশ করার পরই নিস্তরঙ্গ গ্রামটিতে ভিন্ন ধরনের কাণ্ডকারখানা ঘটতে থাকে। মসজিদের ইমাম সাহেব ও আজিজ মাস্টারকে বন্দি করে মেজর এজাজের নেতৃত্বে নির্যাতন শুরু করা হয়। আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে চিত্রা বুড়ির ছেলে হত্যার বিচারের নামে মনা ও তার ছোটোভাইকে ইমাম ও মাস্টারের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়। মিলিটারিরা হত্যা করে সেনবাড়ির একমাত্র উত্তরাধিকারী নীলু সেনকেও। সফদরউল্লাহর বাড়িতে ঢুকে তার স্ত্রী ও শ্যালিকার উপর পৈশাচিক নির্যাতন চালায় মিলিটারিরা। অথচ এদের কারো সাথে মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিযুদ্ধের কোনো সম্পর্কই ছিল না।
উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, নীলগঞ্জ গ্রামের সাথে মুক্তিযুদ্ধের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও মেজর এজাজের নেতৃত্বে থাকা মিলিটারি দলটি তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে গ্রামটিকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে। ফলে উপন্যাসের নীলগঞ্জ গ্রাম আর সাধারণ একটি গ্রাম হয়ে থাকেনিড় মুক্তিযুদ্ধের একটি জলজ্যান্ত ছবি হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন-৫। ক) খুনের বিচার করতে মেজর এজাজ এতটা আগ্রহী হয়েছিল কেন? ৩
খ) 'নীলগঞ্জ আসলে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।'- ব্যাখ্যা করো। ৭

<u>৫(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

নিজেকে ন্যায়বিচারক হিসেবে দেখানোর পাশাপাশি গ্রামবাসীর মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে মেজর এজাজ খুনের বিচার করতে আগ্রহী হয়েছিল। '১৯৭১' উপন্যাসে নীলগঞ্জ গ্রামে মিলিটারি প্রবেশ করার পর স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও স্কুল মাস্টারকে ডেকে এনে নির্যাতন করে মেজর এজাজ। তার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল যেকোনো উপায়ে গ্রামের মানুষকে ভড়কে দেওয়া। এ কাজে সে সামনে নিয়ে আসে মুক্তিবাহিনীর হাতে তার বন্ধু মেজর বখতিয়ারের বন্দি হওয়ার কাহিনি, যার সাথে নীলগঞ্জ গ্রামের মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। তখনই তার সামনে এসে যায় চিত্রা বুড়ির ছেলে হত্যার প্রসঙ্গটি। কৈবর্তপাড়ার ঘটনায় অন্যরা সাধারণত নাক গলায় না - এই সুবাদে সে নিজেকে ন্যায়বিচারক হিসেবে দেখাতে খুনের দায়ে মনা কৈবর্তকে নির্মমভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে হত্যা করে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্তরালে মূলত সে গ্রামবাসীর মনে চরম আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছে।

<u>৫(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী হুমায়ূন আহমেদ। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক'১৯৭১' শীর্ষক উপন্যাসে তিনি গ্রামীণ পটভূমিতে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি আলেখ্য রচনা করেছেন। অন্য আর দশটি সাধারণ অজগ্রামের মতোই '১৯৭১' উপন্যাসের নীলগঞ্জ গ্রাম। নীলগঞ্জের মানুষের জীবনযাত্রায় রাজনীতির কোনো ছোঁয়া না লাগলেও পাকিস্তানি মিলিটারি প্রবেশ করার পর ধীরে ধীরে গ্রামটি যেন একখণ্ড যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হয়।
ত্রিশ-চল্লিশটি পরিবারের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ নীলগঞ্জ। বিস্তীর্ণ জলাভূমি গ্রামটি কাস্তের মতো দুদিকে ঘিরে আছে। এখানকার প্রায় সকলেই কৃষিকাজ করে। শীতকালে প্রচুর রবিশস্য ফলে এখানে। গ্রামের ঘরবাড়িও অতি সাধারণ।
এ রকম একটি গ্রামেই একদিন ভোর হতে না হতেই মেজর এজাজের নেতৃত্বে মিলিটারি প্রবেশ করে। প্রথমেই তাদের হাতে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হন ইমাম সাহেব ও আজিজ মাস্টার। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রহসন করে মনা কৈবর্ত এবং তার হোটো ভাইকে ইমাম ও আজিজ মাস্টারের সামনে গুলি করে হত্যা করে। এর মাধ্যমে পুরো গ্রামে একটা অদৃশ্য আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতে চায় সে। মাস্টারকে উলঙ্গ করে নির্যাতন করা, নীলু সেনকে হত্যা করা, সফদরউল্লাহর স্ত্রী ও শ্যালিকার উপর পাশবিক নির্যাতন করা ইত্যাদির মাধ্যমে মিলিটারিরা পুরো গ্রামটিকেই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে। উপরের আলোচনায় নীলগঞ্জ গ্রামের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই এমনটি আসলে মুক্তিযুদ্ধকালীন সমগ্র বাংলায় চিত্রিত হয়েছে। বাঙালি তরুণ রফিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল বাংলাদেশের অনেক তরুণ। তাই বলা যায়, নীলগঞ্জ আসলে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন-৬। ক) বদিউজ্জামান কাদের ভয়ে এবং কোথায় লুকিয়েছিল? তার অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ৩
খ) 'অপমানের চেয়ে মানুষ মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে।'–' আজিজ মাস্টারের উদাহরণ ব্যবহার করে বাক্যটির সত্যতা যাচাই করো। ৭

৬(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

বদিউজ্জামান মিলিটারিদের ভয়ে জঙ্গলা মাঠের ভিতরে একটি বড়ো গর্তে কোমড় পানিতে লুকিয়েছিল।

মিলিটারি আগমনের পর একেবারেই নিরুপদ্রব, শান্ত-সমাহিত নীলগঞ্জ গ্রামের চেহারা দ্রুতই পালটে যেতে লাগল। গ্রামের প্রায় সকলেই কৃষিকাজ করলেও বদিউজ্জামানের মধুবন বাজারে মনিহারি দোকান আছে। সে প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে দোকানদারি শেষে সন্ধ্যায় দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফেরে। মিলিটারি দল আসতে দেখে পথিমধ্যে সে থমকে দাড়ায় আজ। সে মধুবন বাজারে যাওয়ার জন্য রওনা দিলেও আবার ফেরার পথ ধরে। মিলিটারির কবল থেকে বাঁচতে সে জঙ্গলা মাঠের ভিতরে ঢুকে যায়। একটি বড়ো গর্তে কোমড় পানিতে লুকিয়ে থাকে। কাশি আসতে চাইলে সে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। শেয়াল দেখতে পায় এক জোড়া। পচা গন্ধ আসে পানি থেকে। তবুও ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে সে। নীলগঞ্জ থেকে আসা গুলির শব্দও শুনতে পায়। দীর্ঘ সময় ধরে এভাবেই সে পানির ভিতরে বসে থাকে।

৬(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ তাঁর '১৯৭১' শীর্ষক উপন্যাসে '১৯৭১' সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে নীলগঞ্জ গ্রামের জনজীবন ও যুদ্ধকালীন বাস্তবতা তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। এ উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র আজিজ মাস্টার। পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের রকম-বহর অত্যন্ত লজ্জাজনক হওয়ায় একপর্যায়ে তিনি নিজেই অপমানের বিপরীতে নিজের মৃত্যুকে বেছে নেন।

'১৯৭১' উপন্যাসে আজিজ মাস্টার নীলগঞ্জ গ্রামের কেউ নন। মসজিদের ইমাম সাহেবের মতো তিনিও বাইরের লোক। থাকেন জয়নাল মিয়ার বাড়িতে। মেজর এজাজ ফুস্কুলের দপ্তরির মাধ্যমে মাস্টার সাহেবকে ডেকে পাঠায়। সে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য জানতে চায় কিন্তু আজিজ মাস্টার কোনো তথ্যই দিতে পারেন না। মেজর এজাজ অবশ্য তার কোনো কথা বিশ্বাস করে না। একপর্যায়ে তাকে বন্দি করে নির্যাতন চালায়। কথায় কথায় মেজর এলাম জানতে পারে যে, জয়নাল মিয়ার মেয়ে মালাকে নিয়ে আজিজ মাস্টার কবিতা লেখেন। এরপর সে শাস্তির ধরনেও পরিবর্তন আনে। তার এদেশীয় সঙ্কর। রফিককে বলে, সে যেন আজিজ মাস্টারকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে এবং তার পুরুষাঙ্গে একটা একটা ইটের টুকরা বেঁধে গ্রামে ঘুরিয়ে আনে। মেলার এজাজের 'এ সিদ্ধান্ত আজিজ মাস্টার মন থেকে মানতে না পারলেও তিনি ছিলেন নিরুপায়। জীবন বাঁচানোর দায়ে তিনি নিজেই নিজের পরনের প্যান্ট খুলে ফেলেন। এর আগেই মেজর এজাজ চিত্রা বুড়ির ছেলেকে হত্যার দায়ে ছোটো ডাইসহ মনা কৈবর্তকে গুলি করে হত্যা করে। সেই ভয়ংকর দৃশ্য সামনে থেকে দেখতে হয় আজিজ মাস্টারকে। সময় যতই গড়ায় মেজর এজাজের শাস্তি দেওয়ার নতুন নতুন পদ্ধতি বের হতে থাকে। এবার সে জয়নাল মিয়াকে ধরে এনে তার। সামনে মাস্টার সাহেবকে উলকা অবস্থায় হাজির করে এবং আজিজ মাস্টার যে তার মেয়েকে ভালোবাসে তা জানিয়ে দেয়। রফিককে আবার নির্দেশ দেয়, সে যেন আজিজ মাস্টারকে উলঙ্কা অবস্থায় জয়নাল মিয়ার মেয়ে মালার সামনে নিয়ে ঘুরিয়ে আনে। এমতাবস্থায় আজিজ মাস্টারের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায় এবং লজ্জাজনক শাস্তির বিপরীতে মৃত্যুকে মেনে নেন তিনি। মেজর এজাজের নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়।

অর্থাৎ যখন একের পর এক শাস্তির ধরন পরিবর্তিত হতে লাগল এবং তা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেল তখন আজিজ মাস্টার অপমানের তুলনায় মৃত্যুবেই শ্রেয় মনে করে তা মেনে নিতে প্রস্তুত হন। তার এ আচরণে প্রমাণিত হয়েছে যে, 'অপমানের চেয়ে মানুষ মৃত্যুকেই শ্রেয়-মনে করে।'

প্রশ্ন-৭। ক) অনুফা কে? সে কেন মীর আলির উপর বিরক্ত হয়? ৩

খ) 'অকারণ নিপীড়নই একটি যুদ্ধকে জনগণের মুক্তিযুদ্ধে উপনীত করেছিল।'-'১৯৭১' উপন্যাস থেকে অন্তত তিনটি চরিত্রের উদাহরণ দিয়ে প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো। ৭

৭(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

অনুফা মীর আলির বড়ো ছেলে বদিউজ্জামানের স্ত্রী। গ্রামে মিলিটারির আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় ভীত-সন্ত্রস্ত পরিবেশেও বারবার খাবার খেতে চাওয়ায় সে মীর আলির উপর বিরক্ত হয়।

গ্রামে মিলিটারি আসার পর নীলগঞ্জের মানুষের জীবনে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। মসজিদের ইমাম ও স্কুলের শিক্ষক আজিজ মাস্টারের উপর নির্যাতন করে মিলিটারিরা। বিচারের নামে মনা কৈবর্তকে হত্যা করে। নীলু সেনকে তার বাড়িতেই হত্যা করা হয়। সফরউল্লাহর স্ত্রী ও তার ছোটো বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতন করে মিলিটারিরা। এমন ভীতিকর অবস্থায় বদিউজ্জামানও বাড়িতে ফেরেনি। তাই অনুফা অনেক বেলা হয়ে গেলেও রান্না করেনি। এদিকে খাবারের জন্য মীর আলি কাঁদে। বারবার তাড়া দেয় অনুফাকে। ফলে অনুফা তার শ্বশুর মীর আলির উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়।

৭(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম হুমায়ূন আহমেদ। দেশবিভাগ পরবর্তী সময়ে তিনি বাঙালি পাঠককে বইমুখী রাখতে অসামান্য অবদান রেখেছেন। '১৯৭১' উপন্যাসটি তাঁর কৃতিত্বের অন্যতম স্বাক্ষর। '১৯৭১' সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে নীলগঞ্জের ম ‡ তা একটি গণ্ডগ্রাম ও পাকিস্তানি মিলিটারিদের অত্যাচার-নির্যাতনের কারণে মুক্তিযুদ্ধের এক টুকরা রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে।'১৯৭১' উপন্যাসের আজিজ মাস্টার, সফদরউল্লাহ ও রফিক চরিত্রের উদাহরণে প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করা হলো-

আজিজ মাস্টার; আজিজ মাস্টার হলেন নীলগঞ্জ গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। স্কুল মাস্টারির পাশাপাশি তিনি কবিতা লেখেন। তার কবিতাগুলো মূলত জয়নাল মিয়ার কিশোরী কন্যা মালাকে নিয়ে। মিলিটারি কমান্ডার মেজর এজাজ ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদের নামে অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতন করে। মালার প্রতি তার দুর্বলতার কথা জানতে পেরে উলঙ্গ অবস্থায় তাকে মালার সামনে নিতে চায় মেজর এজাজ। তখন তিনি নিজেই শাস্তি হিসেবে মৃত্যুকে বেছে নেন। সফদরউল্লাহ: সফদরউল্লাহ '১৯৭১' উপন্যাসের একটি অপ্রধান চরিত্র। একদিন মিলিটারিরা তার বাড়িতে এসে তাকে না পেয়ে তার স্ত্রী ও শ্যালিকার উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। এতে সে মিলিটারির প্রতি চরম ক্ষুব্ধ হয়ে দা হাতে নিয়ে দায়ী মিলিটারিকে খুঁজতে থাকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। রফিক: রফিক এ উপন্যাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। মিলিটারি কমান্ডার মেজর এজাজের সহযোগী হিসেবে নীলগঞ্জ গ্রামে প্রবেশ করলেও এক পর্যায়ে তিনি নিজেকে একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। শুরুতে মেজর এজাজের দোভাষী হিসেবে কাজ কর ‡ লও চোখের সামনে অহেতুক অত্যাচার-নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড দেখে তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেনড় এসব অন্যায়, তাই পরিত্যাজ্য। ফলে মেজর এজাজের সাথে শুরু হয় তাঁর কথার যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত স্বজাতির প্রতি ভালোবাসার মূল্য তাঁকে নিজের জীবন দিয়ে চুকাতে হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, আজিজ মাস্টার, সফদরউল্লাহ্, রফিকড় এরা কেউই মুক্তিযুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। মেজর এজাজ কল্পিত শত্রু তথা মুক্তিবাহিনী খোজার নামে একে একে সবাইকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে চরম নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের মুক্তিযুদ্ধের অংশ বানিয়ে দেয়। তাই বলা যায় যে, 'অকারণ নিপীড়নই একটি যুদ্ধকে জনগণের মুক্তিযুদ্ধে উপনীত করেছিল।'

প্রশ্ন-৮। ক) সেন বাড়িতে ডাকাত আসার কথা নয় কেন? বুঝিয়ে লেখো। ৩

খ) পাকিস্তানি বাহিনীর আগমন নীলগঞ্জের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?‘১৯৭১' উপন্যাসের আলোকে তার স্বরূপ বর্ণনা করো। ৭

৮(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

১৮(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

নীলগঞ্জের সেন বংশ বর্তমানে হতদরিদ্র হওয়ায় তাদের বাড়িতে ডাকাত আসার কথা নয়।

১৯৭১' উপন্যাসে ভোরের দিকে হালকা আলোতে চিত্রা বুড়ি দেখে সেনবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কিছু লোক টর্চ লাইট ফেলছে। বুড়ি ভাবে তারা চোতো-বা ডাকাত। কিন্তু সেনদের এখন যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তাতে ডাকাত আসার কথা নয়। নীলগঞ্জ গ্রামে সেনবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা সুসং পর্যাপুরের মহারাজের নায়েব চন্দ্রকান্ত সেন। সেনবাড়িটি দুই বিঘা জমির উপর বিস্তীর্ণ। পূর্বে চন্দ্রকান্ত সেনের অনেক ধনসম্পদ ছিল। তবে বর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকারীরা এই সম্পদের সন্ধান জানে না। সেনবাড়িতে বর্তমানে কেবল একটি প্রকাণ্ড দালান আছে। এ বাড়িতে ইট ছাড়া মূল্যবান কিছুই
নেই। বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী নীল সেন বাড়িটিতে বসবাস করেন।

মূলত সেনদের বর্তমানে কোনো অর্থসম্পদ না থাকায় ডাকাতের আসার কথা নয়।

৮(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)। সহজসরল ভাষা, গভীর জীবনবোধ, রহস্যময়তা এবং মানবিকতার মিশ্রণে তিনি এক নতুন ধারার সূচনা কীভাবে বাধা সৃষ্টি করে, তার অন্যতম সৃষ্টি '১৯৭১' উপন্যাস। গ্রামের সাধারণ মানুষের সাবলীল পথচলার ক্ষেত্রে যুদ্ধ কীভাবে বাথা সৃষ্টি কওে তা সুনিপুণভাবে তিনি এ উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন।

'১৯৭১' উপন্যাসের নীলগঞ্জ গ্রাম একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। এই গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা খুবই সাধারণ। গ্রামের মানুষ যে যার কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অনুফা সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। চিত্রা বুড়ি নিজের মতো একা একা থাকে। গ্রামের বদিউজ্জামান ব্যাবসার সাথে জড়িত। এ অঞ্চলে কৈবর্তপাড়া আছে। তারা মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করে। গ্রামে দুইজন অস্থায়ী লোক বসবাস করেন।' একজন

মসজিদের ইমাম; তিনি মসজিদে থাকেন। অন্য জন স্কুল মাস্টার, তিনি জয়নাল মিয়ার বাড়িতে থাকেন। এ দুইজন অস্থায়ী বাসিন্দাও নীলগঞ্জ গ্রামে স্বচ্ছন্দময় জীবনযাপন করেন। পহেলা মে পাকিস্তানি বাহিনী রাতের অন্ধকারে নীলগঞ্জ গ্রামে ঢোকে। তাদের আগমন গ্রামের সাবলীল জীবনযাত্রাকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বৃদ্ধ মীর আলি চোখে দেখতে না পেলেও কানে শুনতে পান কেউ গ্রামে ঢুকছে। ইমাম সাহেব মিলিটারি দেখে বারবার দোয়াদরুদ পড়তে থাকেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীর আগমনের কথা শুনে হতবাক হয়ে পড়ে। কারণ এ গ্রামে আগে কখনো মিলিটারি আসেনি।

উপন্যাসে দেখা যায় পাকিস্তানি বাহিনী নীলগঞ্জ গ্রামে এসেই তাণ্ডব চালাতে শুরু করে। তারা ইমাম ও মাস্টারকে স্কুলঘরে নিয়ে অমানবিক অত্যাচার করে। ইমামকে মারধর এবং মাস্টারকে সম্ভ্রমহানি করে। গ্রামের চিত্রা বুড়ির ছেলে হত্যার বিচার করতে গিয়ে মনা এবং তার এগারো বছরের তাইকে মেজর নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। সফদরউল্লাহর পরিবারের উপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম অত্যাচার তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন করে তোলে। গ্রামে অন্য একজন সহজসরল বদিউজ্জামানের জীবনে নেমে আসে ভয়াবহ আতঙ্ক।

গ্রামের কৈবর্তরা মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করত। পাকিস্তানি বাহিনীর প্রবেশে তাদের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় দেওয়ার সংবাদে কৈবর্তপাড়ায় তারা গণহত্যা শুরু করে। আগুন জ্বালিয়ে পুরো কৈবর্তপাড়া খালি করে ফেলে পাকিস্তানি বাহিনী। তাই বলা যায়, হুমায়ূন আহমেদ অত্যন্ত মর্ম¯পশী ভাষায় দেখিয়েছেন যে, যুদ্ধ নীলগঞ্জের মতো একটি গ্রামের স্বাভাবিক জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে। গ্রামের মানুষের মনে একদিকে যেমন আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে তাদের মধ্যে প্রতিরোধের এক নতুন স্পৃহাও জন্ম নেয়।

প্রশ্ন-৯। ক) মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের প্রভাব '১৯৭১' উপন্যাসের আলোকে সংক্ষেপে বর্ণনা করো। ৩

খ) "মিলিটারিরা মুসলমানদের ক্ষতি করে না'ড় গ্রামবাসীর এহেন বিশ্বাস যে কতটা ভ্রান্ত ছিল; তার পরিচয় '১৯৭১' উপন্যাসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৭

<u>৯(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

বাংলাদেশের প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রকৃতি মুক্তিবাহিনী ও সাধারণ মানুষের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করেছিল। হুমায়ূন আহমেদের '১৯৭১' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে নীলগঞ্জ গ্রামের পরিবেশ ও জনজীবন। বাংলাদেশের অন্য গ্রামের মতো এ গ্রামও সাধারণ। এখানকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও একই রকম। উপন্যাসে দেখানো হয়েছে মুক্তিবাহিনীরা ঘন জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে ফলে পাকিস্তানিরা তাদের ধরতে পরছে না। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক মুক্তিবাহিনী ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থেকে যুদ্ধ করত। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে অনেক ডোবা, জাল ও পুকুর ছিল। সাধারণ মানুষ প্রাণভয়ে অনেক সময় উপন্যাসের বদিউজ্জামানের মতো পুকুরে কেবল নাক ভাসিয়ে ডুব দিয়ে লুকিয়ে থাকত। গ্রামের রাস্তাঘাট সরু ও কর্দমাক্ত হওয়ায় অনেক সময় সেনাবাহিনীরা প্রবেশ করতে পারত না। এছাড়া উপন্যাসে বলা আছে কালবৈশাখি ঝড়ের কথা। ঝড়ের কারণে সেনাবাহিনীরা অপারেশন করতে ব্যর্থ হত, ফলে মুক্তিযোদ্ধারা, নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে পারত। '১৯৭১' উপন্যাসে লেখক মুক্তিযুদ্ধে ঋতু ও পরিবেশের প্রভাব বেশ সার্থকভাবেই রূপায়ণ করেছেন।

<u>৯(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

হুমায়ূন আহমেদের সুনিপুণ সাহিত্যশৈলীর দিকটি উন্মোচিত হয়েছে '১৯৭১' উপন্যাসে ও'১৯৭১' শীর্ষক উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি বাহিনী ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। এই উপন্যাসে তিনি মিলিটারি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত ধারণা তুলে ধরেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসে পাকিস্তানি মিলিটারিরা মুসলিম ধর্মের হওয়ায় তাদের সম্পর্কে গ্রামবাসীর প্রথমদিকে ইতিবাচক ধারণা ছিল। তবে মিলিটারিদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে গ্রামবাসীর এই বিশ্বাস ভাঙতে বেশি সময় লাগে না। অচিরেই তারা বুঝে যায় মিলিটারিদের কাছে বাঙালি জাতির হিন্দু- মুসলমান সবাই একই। তারা মূলত বাঙালিবিদ্বেষী।

'১৯৭১' উপন্যাসে গ্রামের লোক হানাদার বাহিনী সম্পর্কে লোক মুখে নানা গল্প শোনে। অনেকেই তাদের সাথে যুক্ত হয় রাজাকার হিসেবে। মেজর এজাজ মীর আলিকে সালাম দেওয়ায় এবং কেবল হিন্দুদের গুলি করে মারায় গ্রামবাসীর ধর্মভিত্তিক বিশ্বাস আরও প্রকট হয়। জয়নাল মিয়া সফদরউল্লাহসহ বাকি লোকদের আশ্বস্ত করে যে, মিলিটারিরা মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করে না, ভালো ব্যবহার করে, মেয়েদের সম্ভ্রহানি করে না। তাই গ্রামের লোকদের ভয়ের কোনো কারণ নেই।

তবে তাদের এই বিশ্বাস অতি অল্প সময়ের মধ্যে বালির বাঁধের মতো ভাঙতে সময় নেয়নি। মিলিটারি সুবেদারের হাতে সফদরউল্লাহর স্ত্রী ও শ্যালিকা নির্যাতনের শিকার হলে সকলের ধারণা বদলে যায় ইমাম সাহেবকে মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য পাওয়ার জন্য রক্তাক্ত করলে সাধারণে মানুষের পাকিস্তানিদের উপর থেকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস উঠে যায়। কারণ পাকিস্তানিরা মসজিদের ইমামকেও প্রহার করতে বাদ দেয় না। ওজুর পানি নামাজ পড়তে। এছাড়া আজিজ মাস্টারকে নৃশংসভাবে সম্ভ্রমহানি ও হত্যা করে। জয়নাল মিয়াকে ধরে এনে তার মেয়েদের নিয়ে ভয়ভীতি দেখায়। আগ্রাসি থাবা থেকে বাঁচতে পারেনি। মিলিটারিদের কাছে ধর্মীয় সহানুভূতির কোনো স্থান ছিল না। সকল বাঙালিদেরই তারা ঘৃণা করত এই বিষয় অথচ আজিজ মাস্টার, ইমাম সাহেব, জয়নাল, নিজাম, সফদরউল্লাহর স্ত্রী এবং শ্যালিকা সকলেই জাতিতে মুসলিম ছিল। তবুও তারা কেউ মিলিটারির
গ্রামবাসী দ্রুতই বুঝতে পারে।
সবশেষে বলা যায় যে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিজস্ব কোনো বিবেক-বিবেচনা, ধর্মবোধ ছিল না। তারা নিজেদের সৃষ্টি করা বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে হিন্দু-মুসলিম সকল বাঙালির জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

প্রশ্ন-১০। ক) জয়নাল মিয়া কে? নীলগঞ্জ গ্রামের মানুষ জয়নালকে সহ্য করত কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

খ) 'রফিক মেজর এজাজের সহযোগী হয়েও মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক অবদান রেখেছেন।'-' মন্তব্যটি '১৯৭১' উপন্যাসের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৭

<u>১০(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

জয়নাল মিয়া নীলগঞ্জ গ্রামের সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি। এ কারণে গ্রামের মানুষ জয়নালকে সহ্য করত।
'১৯৭১' উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ নীলগঞ্জ গ্রামের জনজীবনের চিত্র সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নীলগঞ্জ গ্রামে ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ইমাম, কৃষক, জেলে নানান পেশার মানুষ বাস করে। তাদের মধ্যে কেউ অভাবী, কেউ সম্পদশালী। তবে নীলগঞ্জ গ্রামের সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি জয়নাল মিয়া। মধুবন বাজারে তার দুইটি দোকান আছে। কিন্তু জয়নাল মিয়া ব্যক্তি হিসেবে মেরুদণ্ডহীন। গ্রাম্য সালিশ-বিচারের সময় যে যা বলে, সে সবকিছুকে সমর্থন করে। তার এই সমর্থনের কারণে বিচার প্রক্রিয়া জটিল হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রচুর ধনসম্পদ আছে বলে সবাই তাকে সমীহ করে।
অর্থাৎ প্রচুর ধনসম্পদ থাকার কারণেই মেরুদণ্ডহীন হওয়া সত্ত্বেও নীলগঞ্জ গ্রামের মানুষ জয়নালকে সহ্য করত।

<u>১০(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

হুমায়ূন আহমেদের '১৯৭১' উপন্যাসের রফিক চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জটিল চরিত্র। তাঁকে লেখক মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী হিসেবে নীলগঞ্জ গ্রামে আসেন। এই গ্রামে তিনি আগে কখনো না আসলেও পাকিস্তানি বাহিনীকে এই গ্রামে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাহায্য করেন, যা ছিল অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয়। স্কুলে ক্যাম্প স্থাপনের পর তিনি গ্রামের ইমাম সাহেবকে স্কুলে ডেকে নিয়ে আসেন। ইমামকে এই গ্রাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। আবার তিনি আজিজ মাস্টারকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং মেজর এজাজরে আজিজের কাছ থেকে তথ্য পেতে সাহায্য করেন। তিনি গ্রামের নীলু সেনের বাড়ি যেতে পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য করেন। যদিও এই বিষয়গুলোর মধ্যে রহস্য লুকিয়ে ছিল কারণ রফিক ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন মুক্তিযোদ্ধা, যা তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।
রফিক মিলিটারির সহযোগী হয়ে গ্রামে মিলিটারিদের নিয়ে আসলেও তিনি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে গ্রামে মুক্তিকামী মানুষদের সাহায্য করেন। পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম অত্যাচার থেকে গ্রামের মানুষকে বিভিন্নভাবে রক্ষা করেন। গ্রামের ইমাম ও স্কুল মাস্টারকে যখন মেজর এজাজ গ্রামের মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে রফিক তখন তাদেরকে গ্রামের অস্থায়ী বাসিন্দা বলে তাদের ‡ ক ছেড়ে দিতে বলেন। গ্রামের বলাই পাকিস্তানি বাহিনীর ভয়ে মন্দিরে আত্মগোপনে থাকে রফিক তা জানা সত্ত্বেও মেজরকে বলেননি। মনার এগারো বছর বয়সি ভাইকে হত্যা করতে বাধা দেন রফিক। রফিক গ্রামের নিজামকে রহস্যময় জঙ্গলার দিকে যেতে দেখে আনন্দিত হন। কিন্তু মেজর এজাজ নিজাম সম্পর্কে রফিককে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজামকে পাগল বলে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। মীর আলিকে বৃদ্ধ বলে মেজরের নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। কৈবর্তপাড়ায় পাকিস্তানি বাহিনী তল্লাশি করতে চাইলে রফিক কৌশলে তাতেও বাধা দেন। রফিক চতুরতার সঙ্গে এই বিষয়গুলো মোকাবিলা করেন। এই বিষয়গুলো বিবেচনা করলে রফিককে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

প্রশ্ন-১১। ক) মেজর এজাজ আহমেদ তার সহযোগী রফিককে চিনতে পারল না কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

খ) পাকিস্তানি শাসনামলে জাতিগত বিদ্বেষের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে‘১৯৭১’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৭

১১(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

‘১৯৭১' উপন্যাসে মেজর এজাজ আহমেদ এবং তার সহযোগী রফিকের সম্পর্ক মুক্তিযুদ্ধের সময়ের জটিল পরিস্থিতি এবং মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনকে তুলে ধরে। রফিক ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। রফিকের দেশপ্রেমের কারণে মেজর এজাজ তাঁকে চিনতে পারেনি। উপন্যাসের সবচেয়ে জটিল চরিত্র রফিক। রফিক মেজর এজাজের সহযোগী হিসেবে নীলগঞ্জ গ্রামে আসেন। মেজর এজাজের নির্দেশে গ্রামে স্থানীয় মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে জানতে তিনিও কৌতূহলী হয়ে ওঠেন কিন্তু তিনি মেজরের বিভিন্ন পদক্ষেপে বাধা দিতে থাকেন। রফিকের সমালোচনা ও বাধা দেওয়া মেজর এজাজের ম ‡ ন প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। মেজর এজাজ বুঝতে পারে তার সহযোগী একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য। মেজর তাই রফিককে জলাভূমিতে পাঠায় এবং দুইজন মিলিটারিকে নির্দেশ দেয় রফিককে গুলি করার জন্য। রফিক মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও রক্তিম সূর্যের মতো জলাভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকেন। রফিকের পরিবর্তন মেজরকে দুশ্চিন্তায় ফেলে। তার মনে হয় এ যেন এক অন্য রফিক। এ রফিককে সে আগে কখনো দেখেনি। এ রফিক যেন ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের ধারক ও বাহক। তাই বলা যায়, ১৯৭১ উপন্যাসের রফিক একজন দেশপ্রেমিক ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর মুক্তিযোদ্ধা ও গ্রামবাসীদের রক্ষার কৌশল ছিল খুবই বুদ্ধিদীপ্ত, যা ছিল মেজর এজাজের কাছে অপ্রত্যাশিত।

১১(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

যে উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, তার সম্ভাবনা শুরুতেই হোঁচট খায় ভাষার প্রশ্নে। এরপর ভাষাগত পার্থক্যের পথ ধরে দেশটির আঞ্চলিক দুরুত্ব এগোতে নানাবিধ বৈশম্যর দিকে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব,অর্থনৈতিক এককেন্দ্রিকতা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য পাকিস্তান রাষ্ট্রকে আরও বিপন্ন করে তোলে। পশ্চিম পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গি দিনে দিনে আত্মগরিমায় রূপ নিতে থাকে। বাঙালিদের দেখতে থাকে নীচ হিসেবে। পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে জাতিগত উন্নাসিকতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নিপীড়িত পূর্বাঞ্চল যখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ঘুরে দাঁড়াতে যায়, তখন সে টের পায়, তাকে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ-বৈশম্যর মতোই আরোকটি উপাপদান পদানত কওে রেখেছে। তার নাম জাতিগত বিদ্বেষ যার ছড়া;ন্ত পরিণতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। ‘১৯৭১’ উপন্যাসের লেখক তারই একটি স্বরূপ তুলে ধরেছেন নীলগঞ্জে আগত পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্য দিয়ে।

‘১৯৭১’ উপন্যাসে লেখক নীলগঞ্জ নামক একটি সাধারণ গ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে দেখাতে চেয়েছেন। সেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দল এসে যুদ্ধের বিভীষিকা ছড়িয়ে দেয়। দলটির অধিনায়ক মেজর এজাজ। লেখক মেজর এজাজকে এখানে উপস্থিত করেছেন পশ্চিম পাকিস্তানের শ্বাসকদের একজন প্রতিনিধি হিসেবে। তার ভাষা, চিন্তা, কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সম্মিলিত চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। রফিকের সাথে মেজর এজাজের কথোপকথনে ফুটে ওঠে তার গোষ্ঠীগত চেতনার স্বরূপ। এজাজ এ দেশের মানুষদের ভীরু, কাপুরুষ, বেইমান হিসেবে চিহ্নিত করে আধা-হিন্দু হিসেবে। হিন্দুদের প্রতি র ‡ য়ছে তার জাতিগত বিদ্বেষ। হিন্দুদের মূর্তি নিয়ে তার মন্তব্যে ঝরে পড়ে তাচ্ছিল্য। এ অঞ্চলের নারীদের প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তীর্যকভাবে প্রকাশ পায়। উপন্যাসের কাহিনির অগ্রগতির সাথে এ দেশের মানুষকে মানুষ মনে করাই তার জন্য হ হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলের মানুষের মান-অপমান থাকা তার বিশ্বাসের বাইরে মনে হয় সে মূলত এ দেশের মানুষদের বিশ্বাসেরই যোগ্য মনে করে নিবেদিত রাজাকাররা ভালো মুসলমান হিসেবে বিবেচিত হলেও ওঠা-বসা কিংবা মেলামেশার ক্ষেত্রে এ দেশের অধিবাসী হিসেবে নিচু দৃষ্টিভঙ্গির না। ইমাম সাহেব, আজিজ মাস্টার, জয়নালের মতো নীলগঞ্জের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিরা তার কাছে ক্রীড়নকে পরিণত হয়। এমনকি তাদের সাহায্যে জাওতায়ই থেকে যায়। এর সবকিছুর পিছনে যুদ্ধের বাহ্যিক আয়োজনের সাথে কাজ করে পাকিস্তানিদের জাতিগত অহংকার।

সবশেষে বলা যায়, ‘১৯৭১’ উপন্যাসের নীলগঞ্জের মধ্য দিয়েই দেখা যায় পুরো পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশকে। আর মেজর এজাজের চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সামগ্রিক চেতনা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বাইরে। জাতিগত বিদ্বেষের একটি স্বরূপ ফুটে ওঠে উপন্যাসের এজাজসহ পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ড ও চিন্তার মধ্যে।

প্রশ্ন-১২। ক) মৃত্যু একটি ভয়াবহ ব্যাপার। মৃত্যুর সামনে দাড়িয়ে কে কী করবে তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়।'- উক্তিটি কার এবং কোন " প্রসঙ্গে করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

খ) 'দেশপ্রেমের চেতনা লুকিয়ে রাখা যায় না, তা প্রকাশ পায়। ড্ড'১৯৭১' উপন্যাসের রফিক চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্যটির যথার্থতা ব্যাখ্যা করো। ৭

১২(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

আজিজ মাস্টারকে উলঙ্গ করে সারা গ্রাম ঘোরাতে চাইলে তিনি তাতে রাজি হন এবং যেকোনো উপায়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চান। তখন তার এ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রফিক মেজর এজাজ আহমেদের কাছে উক্ত উক্তিটি করেন।

'১৯৭১' উপন্যাসে নীলগঞ্জ গ্রামের নিরপরাধ সাধারণ মানুষের উপর পাকিস্তানি মিলিটারিদের নির্মম নির্যাতনের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। উপন্যাসটিতে তাজিজ মাস্টার মেজর এজাজের অমানবিক অত্যাচারের শিকার হন। মেজর এজাজ তাকে নানা রকম প্রশ্ন করে, কিন্তু মাস্টার সেগুলোর উত্তর দিতে না পরায় মেজর তাকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে আজিজ মাস্টারকে উলঙ্গ করে তার পুরুষাঙ্গে ইট বেঁধে সারা গ্রাম ঘোরাতে বলে। নিরুপায় আজিজ মাস্টার জীবন বাঁচানোর সর্বশেষ উপায় হিসেবে এভাবে অপমানিত হওয়াকে বেছে নেন। আজিজ মাস্টারের এরূপ আচরণে মেজর বিদ্রুপ করে বলে যে, বাঙালিদের কোনো আত্মসম্মানবোধ নেই। তার এ কথায় রফিক অপমানিত বোধ করেন। কারণ তিনি নিজেও একজন বাঙালি। রফিক তখন প্রতিবাদ করে বলেন, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে মানুষ যেকোনো কিছু করতে পারে। এসময় কে কী আচরণ করবে তা আগে থেকে বলার কোনো উপায় নেই। মৃত্যুর মুখোমুখি হলে মেজর নিজেও কাপুরুষের মতো আচরণ করতে পারে। এভাবে রফিক মেজরের মুখের উপর অপমানের জবাব দেন।

মৃত্যুর ভয়াবহতার কাছে যে আত্মসম্মানবোধ তুচ্ছ, সে বিষয়টি মেজরকে বোঝানোর জন্যই রফিক প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

১২(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

১২(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) বাংলা সাহিত্যের একজন অনন্য প্রতিভা। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও চলচ্চিত্রে তাঁর অবদান অসাধারণ। তিনি বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার সূচনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে তিনি অসংখ্য গল্প এবং উপন্যাস রচনা করেছেন। '১৯৭১' উপন্যাসে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলো চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। .

দশপ্রেম একটি অদম্য ও অন্তর্নিহিত অনুভূতি, যা সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মানুষের আচরণ এবং সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে। হুমায়ূন আহমেদের '১৯৭১' উপন্যাসের রফিক এমন একজন ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি, যার মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা গভীরভাবে নিহিত ছিল, যা তাঁর কর্মকাণ্ডে ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠেছে।

রফিক মিলিটারিদের সাথে নীলগঞ্জে আসেন। তাদের সহযোগী হলেও গ্রামের অপরিচিত মানুষদের রক্ষা করতে তিনি ঝুঁকি নেন। তার আত্মার সম্পর্ক তৈরি হয় গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে। গ্রামের বৃদ্ধ মীর আলি যেন তাঁর পরিচিত কেউ। মেজর এজাজ মীর আলিকে সালাম দিয়ে কথা বলতে চাইলে রফিক বাধা দেন। মীর আলি বৃদ্ধ তাই তাকে ছেড়ে দিতে বলেন।

গ্রামের যুবক বলাইয়ের সাথেও রফিকের সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়। রফিক রলাইকে কখনো দেখেননি কিন্তু বলাইকে বারবার সচেতন করার জন্য তিনি উদবিগ্ন হয়ে ওঠেন। মন্দিরে আত্মগোপনে থাকা বলাইকে মেজরের হাত থেকে রক্ষা করেন। নীলগঞ্জ গ্রামের নিজাম পাগলাকে গ্রামের জানার দিকে ছুটে যেতে দেখে রফিক খুব আনন্দিত হন।

গ্রামের দুইজন অস্থায়ী বাসিন্দা ইমাম সাহেব এবং আজিজ মাস্টারকে মেজর এজাজের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। তিনি মাস্টার ও ইমাম সাহেবকে কৌশল অবলম্বন করে. এজাজের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। মাস্টারের অসম্মান এবং ইমাম সাহেবকে মারধর রফিককে বিচলিত করে তোলে।

রফিক পাকিস্তানি বাহিনীকে কৈবর্তপাড়ায় তল্লাশি চালাতে নিষেধ করেন। কৈবর্তরা খুবই নিরীহ তাদের এই পাড়ায় কিছুই নেই, সেখানে গিয়ে কোনো লাভ নেই, এ বিষয়গুলো এজাজকে বলে কৈবর্তপাড়াকে সাময়িকভাবে তিনি রক্ষা করেন।

রফিক এজাজের সহযোগী হয়ে নীলগঞ্জ গ্রামে আসলেও এজাজের নিষ্ঠুর কর্মে তিনি যুক্তি দেখিয়ে বাধা দেন। রফিকের যুক্তি শুনে মেজর এজাজ রফিককে সন্দেহ করা শুরু করে। এজাজের সন্দেহ রফিককে আরও বেশি দেশপ্রেমী ও আত্মত্যাগী করে তোলে। মেজর এজাজ রফিককে বিলের পানিতে নামতে বলে। পাকিস্তানি মিলিটারিকে গুলি করার নির্দেশ দেয়। মেজর এজাজ তখন দেখতে পায় অন্য এক রফিককে যার মধ্যে ফুটে উঠেছে দেশপ্রেমিকের প্রতিচ্ছবি।

রফিক মৃত্যুর কাছে থেকে দেশের জন্য লড়াই করেছেন। শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর দৃঢ়তা তাঁর দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

তাই বলা যায়, হুমায়ূন আহমেদের '১৯৭১' উপন্যাসের রফিক চরিত্র দেশপ্রেমের জীবন্ত উদাহরণ। রফিকের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে সত্যিকারের দেশপ্রেম কখনোই আড়ালে থাকে না, এটি মানুষের কর্ম ও আদর্শে প্রকাশ পায়। মুক্তিযুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের অন্যতম

দৃষ্টান্ত '১৯৭১' উপন্যাসের রফিক চরিত্র।

প্রশ্ন-১৩। ক) 'বিপদের সময় নিজ গোত্রের মানুষের কথাই প্রথম মনে পড়ে।'ড় বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ৩

খ) কৈবর্তপাড়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ আগুন শুধু কৈবর্তপাড়ায় নয়, সারা বাংলাদেশ জুড়ে জ্বলেছে।'- কথাটি তোমার নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করো। ৭

১৩(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

গ্রামে মিলিটারি আসার পর চিত্রা বুড়ির সবার আগে কৈবর্তপাড়ায় খবর দেওয়ার কথা মনে হয়। বুড়ির ছেলে খুন হওয়ার পর থেকে সে কৈবর্তপাড়ায় না থাকলেও বিপদের সময় তার নিজ গোত্রের মানুষের কথা মনে পড়েছে।

'১৯৭১' উপন্যাসে নীলগঞ্জ গ্রামে যখন মিলিটারি আসে, তখন মিলিটারিদের দেখে গ্রামের বিভিন্ন মানুষের মনোভাব লেখক সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। সেসময় চিত্রা বুড়ি নীলু সেনের বাড়ির কালীমন্দিরে বসে কালীমূর্তির সাথে আপন মনে কথা বলছিল। তারপর সে কালীমূর্তিকে জোড়া পাঁঠার আশ্বাস দিয়ে ঘুমাতে যায়। কিন্তু মিলিটারিদের গ্রামে ঢোকার শব্দে বুড়ির ঘুম ভেঙে যায়। বুড়ি ভয় পেয়ে ভাবে হয়তো ডাকাত এসেছে। সে অন্ধকারের মধ্যে দেখে তারা দল বেঁধে যাচ্ছে। সেই সাথে বিভিন্ন জায়গায় টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে স্কুলঘরের দিকে আগাচ্ছে। তখন বুড়ি। বিচার না করায় তাদের উপর বুড়ির ক্ষোভ ছিল। এমনকি তারা বুড়িকে তাদের পাড়ায়ও থাকতে দেয়নি। তবুও বুড়ি সবার আগে নিজ গোত্রের আজিজ মাস্টারকে খবর দেওয়ার কথা ভাবলেও পরক্ষণেই ভাবে যে, সবার আগে খবর দেওয়া দরকার কৈবর্তপাড়ায়, কৈবর্তরা বুড়ির ছেলের খুনের
মানুষদের এই আসন্ন বিপদের কথা জানানোর কথা ভাবে

প্রকৃতপক্ষে, মানুষ কখনো তার শিকড় ভুলতে পারে না। এ কারণেই শত রাগ-অভিমান সত্ত্বেও বিপদের সময় চিত্রা বুড়ির প্রথমে নিজ গোত্রের মানুষের কথা মনে পড়ে।

১৩(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

হুমায়ূন আহমেদ রচিত '১৯৭১' উপন্যাসে কৈবর্তপাড়ায় মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন আহত সৈন্য আশ্রয় নিয়েছিল এমন ধারণায় পাকিস্তানি বাহিনী কৈবর্তপাড়া জ্বালিয়ে দেয়। সেই আগুনের লালচে আভায় দেখা যায় রফিকের দৃপ্ত মুখ। চিত্রা বুড়ি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। অন্ধ মীর আলি আগুন দেখতে পেয়ে চিৎকার করে। গ্রামের মানুষ বের হয়ে আসে। লেখক এমন বর্ণনার মধ্য দিয়ে ইঙ্গিতে পুরো বাংলাদেশকেই তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে যে আগুন কৈবর্তপাড়ায় জ্বলছে, তার আঁচেই যেন পুড়ছিল বাংলাদেশ। এই আগুনই নীলগঞ্জের মতো বাংলাদেশকে পুড়িয়ে ভস্ম করে তুলেছিল। মেজর এজাজের সম্মুখে সন্ত্রস্ত জয়নাল মিয়া জঙ্গলায় আশ্রয় নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কৈবর্তপাড়ার সম্পৃক্ততার কথা প্রকাশ করে। এমতাবস্থায় মেজর এজাজ কৈবর্তপাড়া জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। যদিও কৈবর্তরা তার পূর্বেই নিরাপদে অন্যত্র সরে পড়ে। কৈবর্তপাড়া যখন জ্বলছিল, লেখকের বর্ণনায় তখন এক নাটকীয়তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। লেখক কৈবর্তপাড়ার আগুনের মধ্য দিয়ে যেন পুরো বাংলাদেশকে দেখাতে চেয়েছেন। সেই আগুনের আভায় রফিকের দৃপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন নিকটবর্তী প্রতিরোধের সংকেত।

মুক্তিযুদ্ধটা ছিল বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়া এক অন্যায় যুদ্ধ। এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় আতঙ্ক নিয়ে আসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। তাদের জুলুম, নির্যাতন, হত্যা নিপীড়নের শিকার হয় এ দেশের নিরীহ মানুষ। পাকিস্তানি বাহিনী এ অঞ্চলে যে আগুন জ্বালায়, তার পরিণতি হয় ভয়াবহ। সমগ্র বাংলাদেশকেই তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে। বাংলাদেশের সমগ্র মানুষকে করে তোলে প্রতিপক্ষ। বৃহৎ পরিসরের এই ঘটনাকেই লেখক দেখিয়েছেন নীলগঞ্জের প্রতীকে। পুরো বাংলাদেশই যেন হয়ে উঠেছে কৈবর্তপাড়া।

নীলগঞ্জে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতন, হত্যা ও তাণ্ডবের পর কৈবর্তপাড়া জ্বালিয়ে দেওয়ার ফলস্বরূপ নীলগঞ্জে পাকিস্তানি বাহিনীর সম্ভাব্য প্রতিরোধের মুখোমুখি হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রফিক দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন সেই বার্তা। মেজর এজাজের এ দেশ থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারার যে অনিশ্চয়তার ঘোষণা রফিক মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দিয়ে যান, সেখানেই লুকিয়ে আছে নীলগঞ্জ তথা বাংলাদেশের প্রতিরোধ যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার সংকেত।

প্রশ্ন-১৪। ক) বলাই কে? বলাইয়ের সাথে রফিকের সম্পর্ক কেমন ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

খ)'এজাজ যতই এগিয়েছে, ততই জড়িয়েছে অন্যায় যুদ্ধে।'- মন্তব্যটি '১৯৭১' উপন্যাসের মেজর এজাজের চিন্তা ও কর্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করো। ৭

১৪(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

হুমায়ূন আহমেদের '১৯৭১' উপন্যাসের বলাই একজন সাধারণ গ্রাম্য যুবক। সে নীলগঞ্জ গ্রামের নীলু সেনের ভাগিনা

বলাই ও 'পাকিস্তানি মিলিটারির সহযোগী রফিকের সম্পর্ক ছিল খুবই রহস্যময়। রফিক পাকিস্তানি মিলিটারির সহযোগী হয়েও স্থানীয় বলাইকে পাকিস্তানি মিলিটারির হাত থেকে রক্ষা করেন। বলাইয়ের মামা নীলু সেন পাকিস্তানি মিলিটারির হাতে নিহত হন। মিলিটারি গ্রামে এসেছে বুঝতে পেরেই বলাই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। রফিক বলাইয়ের বাড়িতে গিয়ে বলাইকে ডাকেন কিন্তু বলাইয়ের কোনো সাড়াশব্দ নেই। বলাই কালীমন্দিরে গিয়ে মূর্তির পিছনে লুকিয়ে থাকে। রফিক জানতেন বলাই মন্দিরে আত্মগোপনে আছে তাই রফিক মেজর এজাজকে মন্দিরে ঢুকতে নিরুৎসাহিত করেন। মেজর এজাজ রফিকের চতুরতা বুঝতে পারে এবং মন্দিরের পিছনে কেউ লুকিয়ে আছে বুঝতে পারে। তাই রফিক বিভিন্নভাবে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন।

তাই বলা যায়, '১৯৭১' উপন্যাসে রফিক এবং বলাইয়ের গভীর সংযোগের প্রতিফলন স্পষ্ট হয়েছে। রফিকের সাহসিকতা এবং দৃঢ়তার কারণে বলাই প্রাণে রক্ষা পায়। তাদের সম্পর্ক ছিল সম্মান, বিশ্বাস এবং স্বজাতির প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ। এই সম্পর্ক মুক্তিযুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষের পারস্পারিক বন্ধন এবং সহযোগিতার উদাহরণ হিসেবে কাজ করে।

<u>১৪(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

হুমায়ুনআহমেদ রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক '১৯৭১' উপন্যাসে মেজর এজাজকে চিত্রিত করা হয়েছে নিপুণ বর্ণনায়। নীলগঞ্জে তার ভূমিকা তার পূর্ণ। ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ নয়। একটা গোষ্ঠীগত চিন্তা তাকে প্রভাবিত করেছে। নীলগঞ্জে তার বাহিনীর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে গিয়ে তাকে জড়িয়ে যেতে হয় এক অন্যায় যুদ্ধে।

একটি দখলদার বাহিনীর প্রতিনিধি এজাজকে ঔপন্যাসিক নির্মোহ দৃষ্টিতে চিত্রিত করেছেন। পেশোয়ারের রেশোবা গ্রামের এক অন্ধ পিতার সন্তান র মীর আলিকে দেখে পিতার অসহায়ত্ব মনে পড়ে, তার ব্যক্তিসত্তাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা যায় না। কিন্তু নীলগঞ্জে তার নির্দেশে যখন * ইমাম সাহেব ও আজিজ মাস্টারকে বন্দি করে নির্যাতন করা শুরু হয় তখন থেকে ধীরে ধীরে এজাজের নেতিবাচক দিকগুলো গাঢ় হতে শুরু। তার মধ্যে ব্যক্তি এজাজের থেকেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে মিলিটারি বাহিনীর নেতা মেজর এজাজের চরিত্র।

ইমাম সাহেব, আজিজ মাস্টার, জয়নাল মিয়ার মতো নীলগঞ্জের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তার শত্রুতার শিকার হন। নীলু সেন, কৈবর্ত বালক বিরুকে অকারণে হত্যা কিংবা মনাকে তার অপরাধের কারণে হত্যা, কোনোটিই তার স্বাভাবিক অবস্থান আর ধরে রাখতে পারে না। তার কর্তৃত্ববাদী অন্যায় কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নীলগঞ্জবাসীর প্রত্যক্ষ শত্রুতে পরিণত হয়। তার জাতিবিদ্বেষ নীলগঞ্জকে এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে।

মেজর এজাজকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তার কর্মকাণ্ডে ফুটে উঠেছে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পূর্ণ প্রতিফলন। যেখানে ব্যক্তি এজাজ গৌণ হয়ে মিলিটারি এজাজ মুখ্য হয়ে নীলগঞ্জকে একটি যুদ্ধের মুখোমুখি ঠেলে দেয়। উপন্যাসে নীলগঞ্জবাসীর যুদ্ধে কোনো সম্পৃক্ততা ...থাকা না থাকার সম্ভাব্যতার চেয়েও বড়ো হয়ে ওঠে মিলিটারিদের আগ্রাসন, যার পরিণতিতে মেজর কর্তৃক সৃষ্ট একটি অন্যায় যুদ্ধকে মোকাবিলা করতে গিয়ে নীলগঞ্জবাসীকেও জড়িয়ে যেতে হয় মুক্তিযুদ্ধে।

প্রশ্ন-১৫। ক) মীর আলির অসহায়ত্ব কীভাবে যুদ্ধকে ছাপিয়ে যায়? ব্যাখ্যা করো।

খ) পাকিস্তানি বাহিনী রাজনৈতিক অবস্থাকে সামরিক কায়দায় মোকাবিলা করতে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে কীভাবে শত্রু বানিয়ে ফেলে তা '১৯৭১' উপন্যাসের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

<u>১৫(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর-</u>

'১৯৭১' উপন্যাসে নীলগঞ্জ গ্রামের বৃদ্ধ মীর আলি। তিনি শারীরিক অবস্থার কারণে অসহায় হয়ে পড়েন।

নীলগঞ্জ গ্রামের বৃদ্ধ মীর আলি। তার বয়স প্রায় সত্তর। তিনি চোখে দেখতে পান না। তার মতে, বুড়ো হওয়ার অনেক যন্ত্রণার সবচেয়ে বড়ো যন্ত্রণা রাত-দুপুরে বাহিরে যাওয়া। তিনি তার বড়ো ছেলে এবং ছেলের বউয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ছেলের বউ মাঝে মাঝে তার উপর বিরক্তবোধ করে। তার তখন মনে হয় অনুফা ভালো না। আবার মাঝে মাঝে তার জন্য মীর আলির মমতা হয়, যখন সে মীর আলির যত্ন করে।

নীলগঞ্জ গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর তাণ্ডব শুরু হলে বৃদ্ধ মীর আলি অসহায় হয়ে পড়েন। তার ছেলে বদিউজ্জামান দোকান থেকে ফিরে আসে না। বৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে ঘরের টিন উড়ে চলে যায়। অন্যদিকে অনুফা রান্না করা বন্ধ করে দেয়। ক্ষুধার যন্ত্রণা মীর আলি সহ্য করতে পারেন না। তাই তিনি বলেন, যুদ্ধ হলেও মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা তো চলে যায়নি। একদিকে অনিশ্চিত জীবন, অন্যদিকে ক্ষুধার যন্ত্রণা যেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারকেও ছাপিয়ে যায়। তাই বলা যায়, মীর আলির অসহায়ত্ব যুদ্ধের ভয়াবহতাকেও ছাপিয়ে যায়।

১৫(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এ অঞ্চলটিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দমিয়ে রাখতে গিয়ে একটা যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে। যদিও যুদ্ধটা ছিল 'পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পূর্বাঞ্চলের উপর চাপিয়ে দেওয়া এক অন্যায় যুদ্ধ। '১৯৭১' সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রাথমিকভাবে জনযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ ছিল না। এর প্রথম পর্যায়কে গণহত্যা হিসেবে দেখা যায়। '১৯৭১' উপন্যাসে নীলগঞ্জ গ্রামের মধ্য দিয়ে এরই একটি প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

'১৯৭১' উপন্যাসের নীলগঞ্জ এক প্রান্তিক গ্রাম। গ্রামের পাশের জঙ্গলায় মুক্তিযোদ্ধারা দুজন পাকিস্তানি অফিসার আটক করে নিয়ে লুকিয়ে আছে এমন অভিযোগে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি দল সেই গ্রামে আসে। দলটি গ্রামে প্রবেশ করেই প্রথমে ভীতিসার করতে চায়। পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি অনুরাগ- বিরাগ কিছুই প্রকাশ পায় না উপন্যাসের শুরুতে। তবে মানুষের মনে সৃষ্ট আতঙ্ককে বিরাগ হিসেবেই ধরা যায়। প্রাথমিক এই বিরাগ নীলগঞ্জের মানুষদের পাকিস্তানি বাহিনীর শত্রু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে না। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর কর্মকাণ্ড পুরো নীলগঞ্জকেই তার শত্রু হিসেবে সাব্যস্ত করে।

পাকিস্তানি বাহিনী নীলগঞ্জে প্রবেশ করেই স্থানীয় ইমাম এবং মাস্টারকে আটক করে নেয়। এই শ্রেণির মানুষেরা গ্রামে মান্যজন হিসেবেই বিবেচিত আপা। তারা ইমাম ও আজিজ মাস্টারের উপর অমানবিক নির্যাতন করে। অকারণেই হত্যা করে নীলু সেনকে। তার ধর্মীয় পরিচয়ই ছিল হত্যার কারণ। কৈবর্ত যুবক মনাকে তার অপরাধের জন্য শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মাধ্যমে ন্যায়বিচার করেনি বরং ত্রাস সৃষ্টি করে। সফদরউল্লাহর পরিবারের নারীদের ধর্ষণ করে। কৈবর্তপাড়া পুড়িয়ে দেয়।

নীলগঞ্জ গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর এমন সামরিক আগ্রাসনে ফুটে ওঠে পুরো পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর আগ্রাসনের এক সাধারণ প্রতিচ্ছবি। তারা রাজনৈতিক ব্যর্থতাকে সামরিকভাবে মোকাবিলা করে। নীলগঞ্জের মতো সাধারণ একটি জনপদে পাকিস্তানি বাহিনী ত্রাস সৃষ্টি করতে গিয়ে সকল নিরীহ মানুষকেই শত্রু হিসেবে গণ্য করে। সেখানে তাদের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা পুরো নীলগঞ্জকেই শত্রুতে রূপান্তর করে। এর মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে পুরো পূর্বাঞ্চলের এক সাধারণ চিত্র। সামরিক কায়দায় মোকাবিলা করতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নিরীহ মানুষের উপর ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের মধ্য দিয়ে '১৯৭১' উপন্যাসের নীলগঞ্জের মতো পুরো ভূখণ্ডকেই শত্রু বানিয়ে ফেলে। মুক্তিযুদ্ধ তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন-১৬। ক) 'আমি নিষ্ঠুরতার নমুনা দেখাতে চাই।'- মেজর এজাজ কেন এ কথা বলেছিল? '১৯৭১' উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

খ) '১৯৭১' উপন্যাসের মূল উপজীব্য হলো মুক্তিযুদ্ধে নিপীড়িত সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণা।'- আলোচনা করো।

১৬(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

মজর এজাজ পাকিস্তানি বাহিনী সম্পর্কে গ্রামের মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার ইচ্ছা স্পষ্ট করার জন্য প্রশ্নোক্ত কথাটি বলে।

'১৯৭১' উপন্যাসে নীলগঞ্জ গ্রামের চিত্রা বুড়ির ছেলে কৈবর্ত পাড়ায় খুন হয়। চিত্রা বুড়ি মেজর এজাজকে খুনের বিষয়ে বিচার দেয়। সে চিত্রা বুড়ির ছেলে হত্যার বিচার করার সুযোগটি সাগ্রহে গ্রহণ করে। প্রথমেই সে কৈবর্তপাড়ার মনা এবং তার ছোটো ভাইকে ধরে নিয়ে আসে। সে খুনের অপরাধ স্বীকার করে নেয়। এরই সূত্র ধরে মেজর এজাজ তাকে গুলি করে হত্যা করার মতে এক নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নেয়। তার নির্দেশে মনা এবং তার

ছোটো ভাইকে বিলের পানিতে দাঁড় করানো হয়। মনার এগারো বছরের ভাইটির জন্য রফিকের মায়া হয়। রফিক ছোটো ভাইটিকে হত্যা করার বিরোধিতা করেন। এতে মেজর এজাজ আরও অত্যাচারী কণ্ঠে বলে, এ অঞ্চলে সে নিষ্ঠুরতার একটা নমুনা দেখাতে চায়।

মেজর এজাজ মনে করে তার নিষ্ঠুরতা গ্রামের মানুষ দেখলে তারা পাকিস্তানি বাহিনীর বিরোধিতা করার সাহস পাবে না। তাই সে গ্রামে নিষ্ঠুরতার একটি নমুনা দেখাতে তৎপর হয়ে পড়ে।

১৬(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। তিনি নান্দনিক লেখনীর মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনবাস্তবতা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। '১৯৭১' শীর্ষক উপন্যাসও এর ব্যাতিক্রম নয়। এই উপন্যাসে লেখক বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে নিপীড়িত সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'১৯৭১' উপন্যাসে দেখা যায় নীলগঞ্জ গ্রামের সাধারণ জীবনযাপন করা মানুষেরা বিভিন্নভাবে পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনী দ্বারা নির্যাতন ও নিষ্পেষণের স্বীকার হয়। উপন্যাসের প্রথম দিকে দেখানো হয় অন্ধ মীর আলিকে। ছেলের পরিবারে সে খুব সাধারণ জীবনযাপন

করত। কিন্তু মিলিটারি আসার পর থেকেই তার জীবনপ্রবাহ হঠাৎ করে বদলে যায়। তার ছেলে বদি মিলিটারির ভয়ে পালিয়ে থাকায় তার খোঁজ পাওয়া যায় না।

ছেলের মৃত্যুর আশঙ্কা, গ্রামে বিচরণশীল মিলিটারির তাণ্ডব, ক্ষুধার যন্ত্রণা তার জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

নীলগঞ্জের ইমাম সাহেব অন্য অঞ্চল থেকে এসে এখানে ইমামতি করেন। পাকিস্তানিরা আসার পর তাকে স্কুলঘরে নিয়ে মুক্তিবাহিনীর তথ্য জানতে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়। তিনি বিপর্যস্ত নির্মম পরিস্থিতির শিকার হন। চোখের সামনে চেনা মানুষদের মৃত্যু তার মাঝে ভীতি সঞ্চার করে। গ্রামের আজিজ মাস্টার সাধারণ একজন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক। অন্য এলাকা থেকে এখানে এসে জীবিকানির্বাহ করে থাকেন। তাকেও মিলিটারিরা আটকে রেখে তথ্য বের করতে মানসিক নির্যাতন ও সম্ভ্রমহানি করে। আজিজ মাস্টার এতটাই যন্ত্রণা পেয়েছিলেন যে লজ্জা ও মৃত্যুর মধ্যে তিনি মৃত্যুকে বরণ করেন।

উপন্যাসের সফদরউল্লাহ গ্রামের সাধারণ কৃষক। পরিবার নিয়ে সাধারণ জীবনযাপন করছিল। কিন্তু মিলিটারিরা তার স্ত্রী ও শ্যালিকাকে নির্যাতন করলে তার জীবনে অসহনীয় ঝড় ওঠে। সে হাতে দা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় শত্রুর সন্ধানে।

পরিশেষে বলা যায় যে, '১৯৭১' উপন্যাসের মূল উপজীব্য হলো পাকিস্তানিরা কীভাবে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়েছিল। পাকিস্তানি সৈন্য ও তার দোসরদের অগ্নিসংযোগ, হত্যা, ধর্ষণ নীলগঞ্জ গ্রামের সাধারণ মানুষদের জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

প্রশ্ন-১৭। ক) 'মানুষকে ভয় পাইয়ে দেবার মাঝে একটা আলাদা আনন্দ আছে।'- উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।

খ) '১৯৭১' উপন্যাসের মীর আলি এবং সফদরউল্লাহ যুদ্ধকালীন মানবিক বিপর্যয়ের প্রতীক।'- বক্তব্যটি পর্যালোচনা করো।

<u>১৭(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

মেজর এজাজ নীলগঞ্জ গ্রামের মানুষকে ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখার প্রসঙ্গে রফিককে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

'১৯৭১' উপন্যাসের নিষ্ঠুরতম চরিত্রটি হলো মেজর এজাজ আহমেদ। সে মানুষকে ভয় দেখিয়ে আনন্দ পায়। ভয় দেখানোর মাধ্যমে সে সবাইকে নিজের পায়ের নিচে রাখতে চায়। নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্য সে মনার সাথে সাথে তার ১১ বছর বয়সি নিষ্পাপ ছোটোভাই বিরুকেও হত্যা করে। ভাবে যে, তার এ নিষ্ঠুরতা দেখে গ্রামবাসীরা ভয় পাবে এবং তার সব কথা শুনে চলবে। মেজরের ভাষ্যমতে, এ ঘটনা দেখার পর তারা মিলিটারির নাম শুনলে ভয়ে কাপড় নষ্ট করে দেরে, গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। নৃশংসতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সে আজিজ মাস্টার, ইমাম সাহেব ও জয়নাল মিয়ার কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য আদায়ের চেষ্টা করে। তার এ কর্মকাণ্ড অমানবিক ও বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দেয়। মানুষকে ভয় পাইয়ে দমিয়ে রাখার জন্য যতটা নিচে নামা সম্ভব, মেজর এজাজ ততটাই নিচে নেমেছে।

প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে মূলত মেজর এজাজের নিষ্ঠুরতা, বিকৃত মানসিকতা এবং ভয় দেখিয়ে মানুষকে পায়ের নিচে রাখার আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

<u>১৭(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) বাংলাদেশের কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিক। তাঁর লেখায় সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা ও বাস্তবতা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। যার অন্যতম দৃষ্টান্ত '১৯৭১' উপন্যাস। তিনি এই উপন্যাসে যুদ্ধকালীন মানবিক বিপর্যয়ের সুন্দর উদাহরণ ফুটিয়ে তুলেছেন বৃদ্ধ মীর আলি এবং সফদরউল্লাহর মাধ্যমে।

'১৯৭১' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী ঢুকে তখন অন্ধ মীর আলি বুঝতে পারেন। গ্রামে যখন পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা শুরু হয়, তখন তার কষ্টের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়। পাকিস্তানি বাহিনীর আতঙ্কে স্বামী ঘরে না ফেরায় অনুফা রান্না করতে যায় না। ফলে বৃদ্ধ মীর আলি ক্ষুধার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। এমন সময় ঝড় এসে তাদের ঘরের চালা উড়িয়ে নিয়ে যায়, যা তার জীবনকে অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যায়। গ্রামের চারদিকে যখন পাকিস্তানি বাহিনীর তাণ্ডব শুরু হয়, তার বড়ো ছেলে বাজারে গিয়ে আর ফিরে আসে না- যুদ্ধকালীন এসব বিষয় মীর আলিকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

'১৯৭১' উপন্যাসের অন্যতম নির্যাতিত চরিত্র সফদরউল্লাহ। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তার মানসিক পরিবর্তনের দিকটি ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি নীলগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী প্রবেশ করায় সে আতঙ্কিত হয়ে জয়নাল মিয়ার সাথে আলোচনা করতে যায় যে, তার পরিবারের লোকদের অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিবে কি না। কিন্তু জয়নাল মিয়া তাকে আশ্বাস দেয় যে, পাকিস্তানি বাহিনী মুসলমানদের ক্ষতি করে না। এরই মধ্যে ঝড়ের সময় একজন মিলিটারি এবং তিনজন রাজাকার সফদরউল্লাহর চালা ঘরে এসে ওঠে। এসময় বাড়িতে ছিল সফদরউল্লাহর স্ত্রী এবং শ্যালিকা। পাকিস্তানি সুবেদার ও রাজাকাররা তাদের নির্যাতন করে এবং সম্ভ্রমহানি করে। এরপর থেকে সফদরউল্লাহ মানসিকভাবে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। পাকিস্তানি বাহিনীর পশুসুলভ অত্যাচার তার জীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসে। সে দা হাতে নিয়ে রাজাকার এবং পাকিস্তানি বাহিনীকে খুঁজতে থাকে। পরিশেষে বলা যায়, '১৯৭১'

উপন্যাসের বৃদ্ধ মীর আলির অনিশ্চিত জীবনযাপন, ক্ষুধার যন্ত্রণা এবং সফদরউল্লাহ পরিবারকে অসম্মান করার মধ্য দিয়ে যে মানবিক বিপর্যয়ের ছবি লেখক তুলে ধরেছেন তা মুক্তিযুদ্ধের সময় পুরো বাংলাদেশের ধারক। তাই বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবিক অত্যাচারের এক অনন্য দৃষ্টান্ত উপন্যাসের এই দুই চরিত্র।

প্রশ্ন-১৮। ক) জয়নাল মিয়া মেজর এজাজকে মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে তথ্য দিয়েছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ক) মীলগঞ্জের মতো প্রান্তিক একটি গ্রাম কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের অংশ হয়ে ওঠে। '১৯৭১' উপন্যাসের আলোকে আলোচনা করো। ৭

১৮(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

এ পরিবারকে পাকিস্তানিদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য জয়নাল মিয়া মেজর এজাজকে মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে তথ্য দিয়েছিল। '১৯৭১' উপন্যাসে মেতার এজাজ মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে খবর নেওয়ার জন্য গ্রামের বিভিন্নি শ্রেণি-পেশার লোকদের স্কুলঘরে ডেকে এনে নির্যাতন ও জেরা করত।সে ইমাম সাহেব ও াজিজ মাস্টারের কাচে মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে সঠিক তথ্য না পেয়ে জয়নাল মিয়াকে স্কুলঘওে নিয়েঢ আসে এবং এর মেয়ের ব্যাপারে কথা বলে। এতেই জয়নাল মিয়া ঘাবড়ে যায়। কারণ এরই মধ্যে সফদরউল্লাহর স্ত্রী ও শ্যালিকাকে রাজাকার ও পাকিস্তানি মিলে ধর্ষণ করেছে। এছাড়া আজিজ মাস্টারকেও সে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে ভীত হয়ে পড়ে। পাকিস্তানিদের হাতে নির্যাতিত ও সম্ভ্রমহানি হওয়ার মাস্টার মৃত্যুকে বেছে নেয়। এসব দেখে একদিকে প্রাণভয়, অন্যদিকে নিজের মেয়ের সম্ভ্রম রক্ষার্থে জয়নাল মিয়া দিগভ্রান্ত হয়ে যায়। বলে নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষা করতে জয়নাল মিয়া মুক্তিবাহিনীর তথ্য বলে দেয়।

জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮-২০১২) হাতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন উপন্যাস রচিত হয়। তার মধ্যে অন্যতম '১৯৭১' উপন্যাস। ছোটো গ্রাম নীলগঞ্জের সহজ সরল জনবসতির উপর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অত্যাচার এবং তার পরিণতি নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে '১৯৭১' উপন্যাসে।

'১৯৭১' উপন্যাসে আলোচিত নীলগঞ্জ গ্রামটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। এই গ্রামে জাল ও জলাভূমি রয়েছে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ কাজে নিয়োজিত। স্থানীয় একটি বাজারে মোটামুটি নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে শিক্ষার তেমন প্রসার নেই। একটিমাত্র শূণ্য গ্রামে। সেখানে একজন শিক্ষক।

সাধারণ নীলগঞ্জ গ্রামটি একসময়ে মুক্তিযুদ্ধের অংশ হয়ে ওঠে। এই অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নিয়েছে এই সংবাদের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানিরা গ্রামে আসে। গ্রামে এসেই রাজাকারদের সহযোগিতা নিয়ে এ অঞ্চলের মানুষের উপর নির্মম অত্যাচার চালায় পাকিস্তানি বাহিনী। তারা গ্রামের মানুষকে অকারণে হত্যা করে, নারীদের সম্ভ্রমহানি করে এবং অগ্নিকাণ্ড ঘটায়।

নীলগঞ্জ গ্রামের এক পাশে কৈবর্তরা বসবাস করে। তারা জলাভূমিতে আত্মগোপনে থাকা মুক্তিকামীদের সহযোগিতা করে যুদ্ধে পরোক্ষভাবে জন্মগ্রহণ করে। তাই পাকিস্তানি বাহিনী কৈবর্তপাড়ায় গণহত্যা চালায় এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। কৈবর্তপাড়ার আগুন জ্বলতে থাকে প্রত্যেক রিতিকামীদের মনে। কৈবতপাড়ার এ ধ্বংসলীলা এ অঞ্চলকে যুদ্ধের অংশ করে তোলে।

'১৯৭১' উপন্যাসে নীলগঞ্জ গ্রামের ঘটনাপ্রবাহ থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ গ্রাম-গঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, ধ্বংস, অগ্নিকাণ্ডসহ সমস্ত ব্যাপারই অঞ্চলটিকে, যুদ্ধক্ষেত্রে রূপান্তর করে।

প্রশ্ন-১৯। ক) বদিউজ্জামানের মধ্যে কীভাবে পরিবারের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ পায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

খ) রফিকের পাকিস্তানি বাহিনীর সহচর থেকে মুক্তিকামী মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো। ৭

১৯(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

পরিবারের সব দাযিত্ব পালন, পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা করা এবং অন্ধ বাবার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে পরিবারের প্রতি বদিউজ্জামানের মমত্ববোধ প্রকাশ পায়।

'১৯৭১' উপন্যাসের নীলগঞ্জ গ্রামের একজন ব্যবসায়ী হলো বদিউজ্জামান। নীলগঞ্জ থেকে সাত মাইল দূরে মধুবন বাজারে তার একটি মনহারি দোকান আছে। সম্পদশালী না হলেও মোটামুটি স্বচ্ছলভাবে পরিবারকে নিয়ে তার দিন কেটে যায়। বদিউজ্জামানের পরিবারে রয়েছে তার বৃদ্ধ বাবা ধীর আলি, স্ত্রী অনুফা এবং তিন বছর বয়সি কন্যা পরীবানু। প্রতিদিন সাত মাইল রাস্তা হেঁটে আসা সত্ত্বেও রাতের বেলা অন্ধ মীর আলির মূত্রত্যাগ করতে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে সে তাকে নিয়ে বাইরে যায়। বাবার জন্য চা, গুড় নিয়ে

আসে যাতে তার কাশির উপশম হয়। শীতকালে বাবার জন্য নতুন লেপ বানিয়ে দেয়। বদিউজ্জামান স্ত্রী ও কন্যারও যথেষ্ট খেয়াল রাখে। আজেবাজে খরচ না করে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে নতুন টিনের ঘর বানায়। বদিউজ্জামানের পরিবারের প্রতি মমত্ববোধের সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত হলো, গ্রামে মিলিটারি আসার পর সে মধুবন বাজারে যাওয়ার জন্য রওনা হলেও মাঝপথে পরিবারের কথা ভেবে আবার নীলগঞ্জ ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বিপদে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে সে জঙ্গলা মাঠে আটকে পড়ে এবং তার প্রাণ সংশয় দেখা দেয়।

বদিউজ্জামান নিরাপদ স্থানে না গিয়ে পরিবারের কাছে ফিরে আসতে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়, যা পরিবারের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করে।

১৯(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

'১৯৭১' উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রফিক। পাকিস্তানি সেনা ও গ্রামবাসীর মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিসেবে তাঁর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তবে নীলগঞ্জের নিপীড়িত মানুষের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেতে থাকে ঘটনার ধারাবাহিকতায়। তাঁর চরিত্রের এমন অবস্থান তাঁকে একদিকে নীলগঞ্জসহ মুক্তিকামী মানুষের প্রতিনিধি করে তোলে, বিপরীতে করে তোলে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরাগভাজন।

প্রাথমিকভাবে নীলগঞ্জের সাধারণ মানুষের কেউ কেউ রফিককে পাকিস্তানি বাহিনীরই একজন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইমাম সাহেব, আজিজ মাস্টার, জয়নাল, মীর আলিসহ সকলেই তাঁকে পাকিস্তানি বাহিনীর মতোই আতঙ্কের চোখে দেখে। গ্রামবাসীর সাথে তাঁর নির্মোহ কথোপকথন এবং পাকিস্তানি বাহিনীর নির্দেশ পালনে সদাপ্রস্তুত ভূমিকাই তাঁকে বাঙালিদের কাছে অপরিচিত করে তোলে। উপন্যাসের অগ্রগতির সাথে সাথে তাঁর চরিত্রের বিস্ময়কর দিকটি উন্মোচিত হতে থাকে। ফলে দেখা যায়, তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর সহচর হলেও তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন নেই। তিনি হুকুম পালন করেন অনিচ্ছায়। কখনো কখনো তাদের নির্দেশ না পালনের মতো দুঃসাহসও তাঁর মধ্যে দেখা যায়, যা পাকিস্তানি বাহিনীর অধিনায়ক মেজর এজাজের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি করে।

রফিকের মধ্যে মানবিক সত্তার প্রকাশ প্রথম দেখা যায় কৈবর্ত সন্তান মনা ও তার ভাই বিরুকে হত্যার সময়। কালীমূর্তির পিছনে লুকিয়ে থাকা বলাইকে রক্ষা করা তাঁর চরিত্রের ইতিবাচক দিকটি ফুটিয়ে তোলে। আজিজ মাস্টারের সম্মান তাঁর নিজের সম্মান হিসেবেই বিবেচিত হয়। মেজর থথএজাজের বাঙালিদের প্রতি কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদ তাকে এ দেশেরই একজন করে তোলে। ঝড়ের মধ্যে নিজাম পাগলাকে জঙ্গলায় ঢুকতে দেখলে তাঁর মধ্যে চাপা আনন্দ হয়।

উপন্যাসটি পরিণতির দিকে এগোতে এগোতে রফিককে নিপীড়িত মানুষের পক্ষের লোক হিসেবেই সাব্যস্ত করে তুলেছে। কৈবর্তপাড়ায় আশ্রয় নেওয়া আহত মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষার জন্য তিনি পাকিস্তানি বাহিনীকে সেখানে তল্লাশি করা থেকে বিরত রাখেন। কাহিনির ধারাবাহিকতায় মেজর এজাজের সাথে তাঁর কথোপকথন আরও দৃঢ় হতে থাকে। একসময় মেজর এজাজের কাছে তাঁর স্বরূপ উন্মোচিত হয়। রফিক তখন আর পাকিস্তানি . বাহিনীর সহচর থাকেন না। তিনি তখন নীলগঞ্জসহ সমগ্র মুক্তিকামী মানুষের প্রতিনিধি। ফলে তাঁর নিশ্চিত মৃত্যুও তাঁকে বিচলিত না করিয়ে মেজরের মুখোমুখি দাঁড় করায় এক আত্মবিশ্বাসী রফিক হিসেবে। ফলে উপন্যাসের প্রথম ভাগে দেখা রফিক এবং বিলের পানিতে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো রফিক আর এক থাকে না। পাকিস্তানি বাহিনীর সহচর থেকে তিনি তখন মুক্তিকামী মানুষের প্রতিনিধি।

প্রশ্ন-২০। ক) 'সুন্নত না থাকলেই দুম'ড় কী সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে বুঝিয়ে লেখো। ৩

খ) 'এটি প্রাথমিকভাবে যুদ্ধের কাহিনি, মুক্তিযুদ্ধের নয়।'ড় মন্তব্যটির যৌক্তিকতা '১৯৭১' উপন্যাসের আলোকে উপস্থাপন করো। ৭

২০(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্নোত্ত উক্তিটি দ্বারা নীলগঞ্জবাসীর পাকিস্তানি মিলিটারি সম্পর্কে ধর্মভেদে হত্যা করার ভ্রান্ত ধারণাটি প্রস্ফুটিত হয়েছে। আজিজ মাস্টারকে পাকিস্তানি মিলিটারি আটকে রাখার পর তাকে এগিয়ে দেওয়া ছয়-সাতজন গ্রামবাসীর মধ্যে চাপা উদ্‌বেগ ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় যদি তাদের আশ্বস্ত করে যে খাঁটি মুসলমানদের ভয় নেই। সে নান্দাইল রোড থেকে শুনে এসেছে পাকিস্তানিরা চার কলমা ধরে, কাপড় খুলে দেখে সুন্নত আছে কি না। সুন্নত না থাকলে দুম করে গুলি করে মেরে ফেলে। পাকিস্তানি মিলিটারি সম্পর্কে গ্রামবাসীর ধারণা ছিল লোকমুখে শোনা গল্পের মাধ্যমে। তারা বিশ্বাস করত পাকিস্তানিরা যেহেতু মুসলমান তাই তারা অন্য মুসলমানদের ক্ষতি করে না। গায়ে হাত তোলে না, নির্যাতন করে না। যেহেতু মুসলমানদের সুন্নতে খাতনা করা হয়; সেহেতু খাতনা দেখিয়ে নীলগঞ্জ গ্রামের মুসলিমরা জানে বেঁচে যেতে পারবে পাকিস্তানি মিলিটারিদের হাত থেকে। অর্থাৎ, মুসলমান ছাড়া বাকিদের পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করে গ্রামবাসীর এই ধারণা মনে পোষণ করার বিষয়টি প্রশ্নোক্ত উক্তিতে ফুটে উঠেছে।

২০(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) কালজয়ী ব্যক্তিত্ব। তাঁর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অন্যতম উপন্যাস '১৯৭১'। এই উপন্যাসে তিনি মুক্তিযুদ্ধের মানবিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিকগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসটি সংক্ষিপ্ত হলেও এতে নিহিত রয়েছে গভীর মানবিক দিক, যা মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

যুদ্ধ বলতে বোঝায় দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে সংঘটিত একটি সশস্ত্র সংঘর্ষ যা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় কারণে হয়ে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একটি পক্ষ সামরিকভাবে শক্তিশালী হতে পারে এবং অন্যপক্ষ তুলনামূলক দুর্বল হলেও গোপন আক্রমণ বা আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে।

'১৯৭১' উপন্যাসে নীলগঞ্জ গ্রামে যুদ্ধের ভিন্ন চিত্র পরিলক্ষিত হয়। নীলগঞ্জ গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর একতরফা অত্যাচার করা হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে নীলগঞ্জ গ্রামের মানুষের জীবন ছিল সহজসরল। পাকিস্তানি বাহিনীর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। তাই তাদের কোনো ধরনের যুদ্ধ প্রস্তুতিও ছিল না।

পাকিস্তানি বাহিনী গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনকে যুদ্ধময় করে তোলে। তারা গ্রামের ইমাম এবং মাস্টারকে বন্দি করে রাখে। গ্রামের জনসাধারণের মনে বিভিন্ন আতঙ্ক সৃষ্টি করে। নারীদের সম্ভ্রমহানি করে এবং মানুষদের হত্যা করে। গ্রামের কৈবতপাড়ায় গণহত্যা চালায় এবং সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। পাকিস্তানি বাহিনী এককভাবে এই গ্রামে যুদ্ধ করে। জনসাধারণের মধ্যে তাদেরকে প্রতিরোধ করার মতো কোনো অস্ত্র বা মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তাই এটিকে প্রাথমিকভাবে যুদ্ধের কাহিনি বলা যায়। এখানে অপর পক্ষের যুদ্ধে অংশগ্রহণ অনুপস্থিত ছিল। সাধারণ মানুষ যুদ্ধ সম্পর্কে বোঝার আগেই তাদের জীবন যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে, তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। যুদ্ধে তাদের প্রত্যক্ষ কোনো অবদান ছিল না। তাই বলা যায়, হুমায়ূন আহমেদের '১৯৭১' উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এটি মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি বীরত্বগাথা বা যুদ্ধের গল্প নয় বরং এখানে সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধ, তাদের আবেগ, হতাশা, ভয় এবং আশা উঠে এসেছে। তাই এটি প্রাথমিকভাবে যুদ্ধের কাহিনি, মুক্তিযুদ্ধের নয়।

প্রশ্ন-২১। ক) রফিক কেন মিলিটারিদের কৈবর্তপাড়ায় তল্লাশি করা থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন? ৩

খ) কৈবর্তরা আসলে মুক্তিযুদ্ধকালীন মুক্তিকামী মানুষের প্রতিচ্ছবি।'- '১৯৭১' উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৭

২১ (ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

কৈবতপাড়ায় ৬-৭ জন আহত মুক্তিযোদ্ধা লুকিয়ে ছিল বলে রফিক মিলিটারিদের কৈবতপাড়ায় তল্লাশি করা থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন।

'১৯৭১' উপন্যাসের সবচেয়ে জটিল চরিত্র হলো রফিক। তাঁর কর্মকাণ্ড দেখে কখনো মনে হয় তিনি মিলিটারিদের সহযোগী, আবার কখনো মনে হয় তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনকারী। তিনি মেজর এজাজের সাথে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে ঘুড়ে বেড়ান, নানা রকম খবর সরবরাহ করেন, আবার উলটা দিকে তিনি মেজরের শাস্তি থেকে ইমাম সাহেব, আজিজ মাস্টার, বিরু, বলাই প্রমুখকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। মেজর যখন কৈবতপাড়ায় তল্লাশি করতে চায়, তখন রফিক তাকে বাধা দেন। আশ্বস্ত করেন যে, সেখানে কোনো মুক্তিযোদ্ধা নেই। কিন্তু তাঁর গতিবিধি দেখে বোঝা যায় যে, কৈবর্তপাড়ায় আহত মুক্তিযোদ্ধাদের লুকিয়ে থাকার বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। এক্ষেত্রে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর উপন্যাসে বিষয়টি স্পষ্ট করেননি। কিন্তু তাঁর চিরায়ত রচনাশৈলীর মাধ্যমে উপলব্ধি করতে বাধ্য করেছেন যে, রফিক আসলে কৈবর্তপাড়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় নেওয়ার সংবাদটি জানতেন। তাদেরকে পাকিস্তানি মিলিটারির কবল থেকে রক্ষা করার জন্যই তিনি মেজর এজাজকে সেখানে তল্লাশি করতে বাধা দিয়েছিলেন।

রফিক বাইরে থেকে মিলিটারিদের সহযোগিতার কাজ করলেও মনে মনে তিনি মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের লোক ছিল। তাই আহত মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচানোর জন্য তিনি মিলিটারিদের কৈবর্তপাড়ায় তল্লাশি করা থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন।

২১ (খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর

হুমায়ুন আহমেদ রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক '১৯৭১' উপন্যাসের কৈবর্তপাড়ার মানুষেরা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছিল। জঙ্গলায় লুকিয়ে থাকা যেসব মুক্তিবাহিনীদের কাছে তারা খাবার সরবরাহ করত। ফলে মিলিটারিরা কৈবর্তপাড়া জ্বালিয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধে তাদের এমন সংগ্রামী ভূমিকা ও অত্মত্যাগের কারণে তাদের মুক্তিকামী মানুষের প্রতিনিধি বলা যায়।

'১৯৭১' উপন্যাসে নীলগঞ্জ গ্রামের এক প্রান্তে বসবাস করে কৈবর্ত বা জেলে সম্প্রদায়ের লোক। তাদের জীবনধারা নীলগঞ্জের সাধারণ অধিবাসীদের থেকে স্বন্ত্র তারা বছরে উলেকযেগ্য একটা জনমহলে মাছ ধরে সময় কাটায় তাদেও মধ্যে গোত্রীয় ঐক্য দৃঢ়। তাদেও চরিত্রের মধ্যে রয়েছে সহজাত বেপরোয়া ভাব। তাদের আগে-পিছে কিছুতেই নীলগঞ্জবাসীর আগ্রহ দেখা যায় না।

উপন্যাসে দেখা যায়, নীলগঞ্জের পাশের জঙ্গলায় মুক্তিবাহিনী লুকিয়ে আছে এমন ধারণা নিয়ে গ্রামে মিলিটারি আসে। মিলিটারির অত্যাচারের বিভীষিকায় জয়নাল মিয়া থাকার করেন মুক্তিবাহিনীর কথা। জয়নাল মিয়ার ভাষ্যমতে মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামের পাশের জঙ্গলায় আশ্রয় নেন। কৈবর্তরা জঙ্গলায় মুক্তিযোদ্ধাদের খাবারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয় তাদের পাড়ায়।

নীলগঞ্জের পাশের জঙ্গলায় আশ্রয় নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করা এবং আহতদের নিজেদের পাড়ায় আশ্রয় দেওয়ার মধ্য দিয়ে কৈবর্তরা মুক্তিযুদ্ধের অংশ হয়ে ওঠে। গ্রামের মানুষের সাথে তাদের সংযোগ কম থাকলেও মুক্তিযোদ্ধারা তাদের কাছেই সাহায্য পান। তাদের সন্তানরা শহিদ হল পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতায়। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সংযোগের কারণে তাদের গৃহহারা হতে হয়। তাদের সমগ্র পাড়া জ্বালিয়ে দেয় হানাদার বাহিনী। এভাবে তাদের অবদান ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে মুক্তিকামী মানুষের, প্রতিচ্ছবি।

২২। ক) মেজর এজাজের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল কেন? ব্যাখ্যা করো ৩

খ) '১৯৭১' উপন্যাসে প্রতিফলিত নীলগঞ্জের দুইজন অস্থায়ী বাসিন্দা কারা? মুক্তিযুদ্ধে তাদের সম্পৃক্ততা বর্ণনা করো। ৭

<u>২২(ক) নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

মেজর এজাজ তার সহচর রফিকের কথা শোনার পর তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল।

মেজর এজাজ নীলগঞ্জ গ্রামে আসার সময় পথঘাট চেনা ও বাঙালিদের সাথে যোগাযোগ করার সুবিধার্থে রফিককে সাথে নিয়ে নীলগঞ্জ গ্রামে আসে। এখানে এসে মেজর এজাজ নিরাপরাধ মানুষকে নির্যাতন শুরু করে। যাতে কৌশলে বাধা দেন রফিক। পরবর্তীকালে রফিকের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মেজর এজাজের মনে হয় রফিক মুক্তিবাহিনীর সাথে জড়িত; কৈবর্তপাড়া থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সরে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া এবং খবর পৌছে দেওয়ার পিছনে রফিকের ভূমিকা আছে। তাই মেজর এজাজ সিদ্ধান্ত নেয় রফিককে হত্যা করার। হত্যার পূর্ব মুহূর্তে রফিক তীক্ষ্ণস্বরে মেজর এজাজকে সতর্ক করে দেন যে, তার কর্মকাণ্ডের কারণে সে জীবিত অবস্থায় এই ভূখণ্ড থেকে ফিরে যেতে পারবে না।

তাই রফিকের কথায় নিজের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি অনুমান করে মেজর এজাজের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে।

<u>২২(খ) নম্বর প্রশ্নের উত্তর</u>

হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর নিপুণ জীবনাভিজ্ঞতা, রাজনীতি সচেতনতা ও মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে '১৯৭১' উপন্যাসে'। তিনি উপন্যাসে উল্লিখিত গ্রামের দুইজন অস্থায়ী বাসিন্দার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের এক বিচিত্র দিক তুলে ধরেন, যেখানে সাহস, ত্যাগ এবং মানবতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'১৯৭১' উপন্যাসে আলোচিত নীলগঞ্জ গ্রামের দুইজন অস্থায়ী বাসিন্দা হলেন মসজিদের ইমাম সাহেব এবং স্কুলের মাস্টার আজিজ রহমান মল্লিক। ইমাম সাহেব নীলগঞ্জ গ্রামের মসজিদের ইমাম। '১৯৭১' উপন্যাসে তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতীক। নীলগঞ্জ গ্রামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢুকলে ইমাম সাহেব নিজেকে এক অদ্ভুত দ্বিধার মধ্যে আবিষ্কার করেন। তিনি কেন এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইমামতি করতে এসেছেন তা ছিল রহস্যময়। তিনি মসজিদেই থাকতেন। বাসিন্দাদের গ্রামের বাড়িতে তার খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। তিনি এই গ্রামে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নীলগঞ্জ গ্রামের অন্য আর একজন অস্থায়ী বাসিন্দা আজিজ রহমান মল্লিক। তার বয়স আটত্রিশ। তিনি ছিলেন এই গ্রামের স্কুলের একমাত্র শিক্ষক। তার নানা রকম অসুখবিসুখ ছিল। শীতকালে তার হাঁপানি বেড়ে যায়, গরম কালে কিছুটা ভালো থাকেন। আজিজ মাস্টার একজন কবি। গ্রামের ধনী ব্যক্তি জয়নাল মিয়ার বড়ো মেয়েকে দেখলে তার অন্যরকম আবেগের সৃষ্টি হয়। তিনি 'মালা রানী' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন।

'১৯৭১' উপন্যাসের নীলগঞ্জ গ্রামে হঠাৎ একদিন পাকিস্তানি বাহিনী আসে মুক্তিকামী মানুষের খোঁজে। পাকিস্তানি বাহিনি গ্রামে এসে গ্রামের স্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করে। এরপর থেকে সহজসরল গ্রামের মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম সাহেব এবং আজিজ মাস্টার।

পাকিস্তানিরা ইমাম সাহেবকে স্কুলে ডেকে পাঠান। তিনি ভয়ে দোয়াদরুদ পড়তে থাকেন। তার কাছ থেকে মেজর এজাজ এলাকার বিভিন্ন তথ্য জানতে চায়। তিনি কোনো উত্তর দিতে পারেননি। তাই মেজর এজাজ রেগে তাকে স্কুলের কক্ষে বন্দি করে রাখে এবং মারধর করে। এভাবে ইমাম সাহেবের সাধারণ জীবন যুদ্ধময় হয়ে ওঠে।

নীলগঞ্জ গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী আসার আগে আজিজ মাস্টারের জীবন ছিল প্রেমময়। পাকিস্তানি বাহিনীর আগমনে তার জীবন যন্ত্রণাদগ্ধ হয়। মেজর এজাজ স্কুলে এসে স্কুলের দারোয়ানকে দিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আসে। সে মাস্টারকে গ্রামের মুক্তিবাহিনী এবং

হিন্দুদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। পাকিস্তানের জাতিসত্তা সম্পর্কে তার ভাবনা জানতে চায়। মাস্টার তাকে কোনো তথ্য দিতে ব্যর্থ হলে সে তাকে স্কুলের একটি কক্ষে বন্দি করে রাখে। মেজর এজাজের বর্বরতার শিকার হন তিনি। সে মাস্টারের সম্ভ্রমহানি করে, তাকে বিবস্ত্র করে। পাকিস্তানী বাহিনির নির্মমতার শিকার হয়ে তিনি মৃত্যুকে বেছে নেন।

তাই বলা যায়, '১৯৭১' উপন্যাসে নীলগঞ্জ গ্রামের দুইজন অস্থায়ী ব্যক্তির জীবন সহজসরল থাকলেও মুক্তিযুদ্ধে তাদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। মেজর এজাজ এই দুইজন ব্যক্তিকে নির্যাতন করে গ্রামে নিষ্ঠুরতার নমুনা আঁকেন। তারাই যেন হয়ে ওঠেন বিধ্বস্ত যুদ্ধক্ষেত্র।